রূপসাগর

সুবোধ ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
১৭৭-এ, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
বিভূতি সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ-মুদ্রক
নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই
তৈফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড সন্স

দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সুবোধ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র তাঁর আবির্ভাব, ব্যক্তি হিসেবেও তিনি বিস্ময়কর। সুবোধ ঘোষ। প্রচুরতর তাঁর অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্যেও বিপুলতর অধিকার। মননশীল প্রতিভার স্পর্শে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অনন্যসাধারণ।

উদার উন্মুক্ত পৃথিবীর আহ্বান তাঁকে প্রথম যৌবনেই টেনে নিয়ে গেছে দূর থেকে সুদূরে। সারা উত্তরভারত তিনি পর্যটন করেছেন, সীমান্ত পেরিয়ে গেছেন আজাদী ওয়াজিরিস্তানে। ব্রহ্মদেশ থেকে মধ্য এশিয়া—বিভিন্ন জনপদ তিনি নানা উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেছেন। বিপুল তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। সার্কাসে চাকুরি করেছেন, এডেন-আবাদানে হজগামী তীর্থযাত্রী মুসলমানদের টীকা দিয়ে বেড়িয়েছেন। রাঁচী-হাজারীবাগ বাসে কণ্ডাক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। চায়ের ব্যবসা করেছেন কিছুকাল, বেকারি ও মিষ্টির দোকান খুলেছেন। গভীর গহন অরণ্যে হিংস্র জন্তু শিকার করেছেন। একটা চিতাবাঘ পুষেছিলেন অনেকদিন। এখন আনন্দবাজার পত্রিকার তিনি সহযোগী সম্পাদক। বহু বিচিত্র জীবিকা আর বহু রকমারি জীবনান্বেষণে বিপুলা পৃথিবীর বহু আশ্চর্য রহস্যের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখী পরিচয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় অরণ্যভূমি হাজারীবাগে ১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম। বাবা ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ, মা শ্রীকনকলতা দেবী। হাজারীবাগ স্কুলে ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই সেখানকার বিখ্যাত দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ্ মহেশচন্দ্র ঘোষের আনুকূল্যে তাঁর গ্রন্থাগারে অবাধ অধ্যয়নের সুযোগলাভ করেছিলেন।

সেণ্ট কলম্বাস কলেজে কিছুকাল পড়ার পর তিনি ভারত-দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। বয়স তখনও তাঁর সামান্য, সবেমাত্র যৌবন এসেছে দেহে। পাথেয়ের জন্য ভাবলেন না, শারীরিক অসুবিধার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হলেন না। নিঃসম্বল তরুণ কখনও হেঁটে, কখনও রেলে চড়ে, কখনও বা গরুর গাড়ি চেপে বেড়াতে লাগলেন। এ পল্লী থেকে আর এক পল্লী। এ শহর থেকে অন্য শহর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে গেলেন ওয়াজিরিস্তানে। দুর্ধর্ষ মানুষদের বিরল-বসতি জনপদ। নানা জাতি আর বহুবিচিত্র সংস্কৃতির অভিনব সমাবেশ ভারতবর্ষে। এই বৈচিত্র্য শুধু বিদ্যা দিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ হয়েছে তাঁর। জেনেছেন মাহাত্ম্য বা চরিত্রবলে অধিকাংশ সাধারণ মানুষও হীন নয়। অর্থাভাবে পরিব্রাজক সুবোধ ঘোষ যখন এগোতে পারছেন না, কতবার ভিক্ষাজীবি দরিদ্র সবখানি সঞ্চয় তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। তাঁকে কতদিন অন্ন দিয়েছে কত দীন মানুষ। পীড়ায় শুশ্রূষা করেছে কত আর্তজন। ভারতের নানা প্রদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুধু তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃত করেনি, প্রত্যয়কেও মহিমান্বিত করেছে।

জীবিকা হিসেবেও তিনি বহুতর পেশা গ্রহণ করেছেন। বোম্বে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীর ডিপ্লোমা কোর্স পাস করে এডেন, জাঞ্জিবার, আবাদান, মধ্য প্রাচ্যের নানা স্থানে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ

করেছেন। বেশিদিন ভাল লাগে নি এই জীবন। ব্রহ্মদেশে গিয়ে একবার মনোমত চাকুরির সন্ধান করেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসতে হয় নিরাশ হয়ে। একাউন্টেন্সি সম্পর্কে তাঁর ভাল জ্ঞান আছে, কতকগুলি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে একাউন্টেন্টের কাজ করেছেন। কেরাণী হিসেবেও চাকুরি করেছেন কয়েক জায়গায়। তা পছন্দ না হওয়ায় কিছুকাল বেকার-জীবন কাটিয়ে একটা একটা বাস কোম্পানীতে কণ্ডাক্টরের চাকরি নিয়েছিলেন। বাস চলাচল করতো হাজারীবাগ থেকে রাঁচী আবার রাঁচী থেকে হাজারীবাগ।

একদিন রাত্রে বাস চলেছে। জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। হঠাৎ কণ্ডাক্টার সুবোধ ঘোষ দেখলেন, পথের মধ্যে একটা বাচ্চা চিতা বাঘ পরম নির্ভয়ে শুয়ে আছে। ঘণ্টি নেড়ে থামালেন বাস। বাচ্চাটাকে তুলে নিলেন কোলে। ড্রাইভার কিছুতেই হিংস্র জন্তুটাকে নেবে না, সুবোধ ঘোষ আনবেনই।

বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন তিনি। নাম দিলেন 'বিলি'। দিনে দিনে বড় হতে লাগলো। গলায় বেল্ট বেঁধে রাখলেন। বিলি দিনে পাঁচ সের করে মাংস খেতো। বাস কোম্পানী খরচ জোগাতো মাংসের। একদিন একটা কুকুরের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো বিলি। রক্তাক্ত কুকুরটা মারা গেল তক্ষুণি। আর একদিন একটা ছোট ছেলেকে কামড়াতে গেল। পাশেই ছিলেন সুবোধ ঘোষ। তিনি বিলির বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। উন্মত্ত চিতা বাঘ তাঁর আঙুল কামড়ে দিল।

সবাই বললেন, বিলিকে চিড়িয়াখানায় দাও। সুবোধ ঘোষও বুঝলেন, বন্য জানোয়ারকে পোষ মানানো যাবে না। পুণা ও বোম্বেতে একটা সার্কাস পার্টিতে কিছুকাল চাকরি করেছিলেন তিনি। হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের আজব খেলা দেখানো হত সে-সার্কাসে। তিনি সেখানে শারীরিক কসরৎ দেখাতেন। সে এক বিচিত্র জীবন। সার্কাসের বাঘ, সিংহ, হাতি, বাঁদর, ভল্লুকের সঙ্গে তাঁর একটা আশ্চর্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বেশিদিন সার্কাসে ছিলেন না, কিন্তু হিংস্র জন্তুদের চিনেছিলেন অন্যতর দৃষ্টিতে। তিনি স্থির করলেন, বিলিকে চিড়িয়াখানায় পাঠাবেন না, অরণ্যচারীকে অরণ্যে মুক্তি দেবেন।

শীতকালের এক মধ্যরাত্রিতে হাজারীবাগ থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে কসুম্ভা জঙ্গলে বিলিকে নিয়ে গেলেন তিনি। আকাশে জ্যোৎস্না, রূপালী আলো এসে পড়েছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কাঁধে বন্দুক, ঝুলিতে কিছু খাবার। বেল্ট-বাঁধা বিলিকে নিয়ে চলেছেন তিনি।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বিলির বেল্ট খুলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ এক লাফে বিলি উধাও হয়ে গেল গভীরতর জঙ্গলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ফেরার উদ্যোগ করলেন। যেই কয়েক পা এগিয়েছেন, কোত্থেকে এক লাফে তাঁর পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়লো বিলি। আর সে নড়ে না।

আরণ্য জীব কি তবে অরণ্যে জীবনের স্বাদ খুঁজে পেল না? বিলিকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই সে পেছন ছাড়ে না। নিশুতি শীতার্ত রাত, জঙ্গলের মধ্যে তিনি একা। একটি ঢিল ছুঁড়ে মারলেন অনেক দূরে। ঢিলটা যেখানে গিয়ে পড়লো, বিলি এক লাফে সেখানে গিয়ে হাজির। সেই অবসরে তিনি চলে আসার উপক্রম করলেন। কিন্তু আর এক লাফে আবার এসে হাজির।

কিছুকাল পরে চিড়িয়াখানাতেই দিয়ে দিলেন বিলিকে। একদিন দেখতে গিয়েছিলেন সেখানে। কেমন যেন অসুস্থ অস্বাভাবিক মনমরা দেখলেন বিলিকে। বালিতে পা ঘষে ঘষে বহু জায়গা ছিঁড়ে ফেলেছে। কিছুদিন পরে শুনলেন, বিলি সেখানে মারা গেছে।

বছর দুই চাকরী করার পর বাস কোম্পানী ছেড়ে দিলেন তিনি। একটা চায়ের ব্যবসা খুললেন। কিছুদিনের মধ্যেই বেশ লাভ হতে লাগলো। কতকগুলি শাখাও খুললেন ব্যবসায়ের। কিন্তু অনিবার্য কারণে সে-ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হল।

একটা জীবিকার যখন সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন তিনি, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে তিনি সাংবাদিকতার কাজে যোগদান করেন। সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন তিনি কখনও দেখেন নি। সাংবাদিকতাকে নিয়েছিলেন শুধুমাত্র জীবিকা হিসাবেই।

'অনামী সংঘ' নামে একটি সাহিত্যচক্রে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। সেখানে পঠিত প্রত্যেকটি লেখার সমালোচনা করতেন, তিনি কিন্তু নিজে পড়তেন না কোন স্বরচিত লেখা। সহাধ্যায়ীদের হুকুম হল, তাঁকেও পড়তে হবে নিজের লেখা গল্প কি প্রবন্ধ।

রবিবারের সন্ধ্যায় সভা। সকালে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন তিনি। কি লিখবেন? ভাবলেন, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব নিয়ে একটা প্রবন্ধ খাড়া করবেন। কিন্তু খানিকটা লিখে ভাল লাগলো না তাঁর। একটা গল্পই লিখে ফেললেন। একটি ড্রাইভার আর তার নড়বড়ে জগদ্দল মোটরের গল্প। নাম দিলেন 'অযান্ত্রিক'। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এই তাঁর প্রথম রচনা।

সভায় গল্পটি পড়ে শোনালেন সুবোধ ঘোষ। তাঁর ভয় ছিল, কেমন মন্তব্য শোনা যাবে কে জানে। কিন্তু আশ্চর্য, শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। গল্পটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সকলে। আনন্দবাজার দোল-সংখ্যায় (১৯৪০) প্রকাশিত হল গল্পটি। তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল'। সাহিত্যে বাস্তবতার একটা নতুন অধ্যায় রচনা করলেন তিনি। একটি নতুন যুগের শুরু হলো।

তারপর থেকে তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। উপন্যাস লিখেছেন অনেক কয়টি। তাছাড়াও সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করেছেন তিনি। তাঁর বিচিত্র রচনামালায় প্রতিভাদীপ্ত মনন-শীলতা প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্ব, ব্যঞ্জনাময় ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তিমত্তার নিঃসংশয় প্রমাণ। একথা অসংকোচে বলা যায়, বাংলা-সাহিত্যের তিনি অন্যতম বলিষ্ঠ ভরসা।
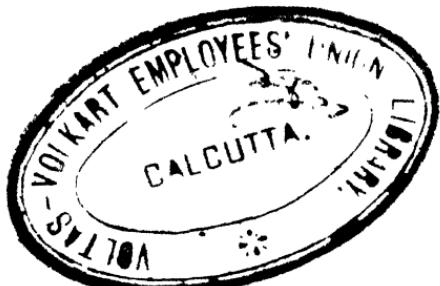
.........সুবোধ ঘোষের অন্যান্য বই.........

ফসিল, পরশুরামের কুঠার, শুক্লাভিসার, গ্রাম যমুনা, মণি-কর্ণিকা, জতুগৃহ, মনভ্রমরা, থির বিজুরী, পুতুলের চিঠি, তিলাঞ্জলি, একটি নমস্কারে, শতভিষা, গঙ্গোত্রী, ত্রিযামা, শ্রেয়সী, শুন বরনারী, মনোবাসিতা, গল্পলোক, ভোরের মালতী, কুসুমেষু, পলাশের নেশা, ভারত-প্রেমকথা, কিংবদন্তীর দেশে, রূপসাগর প্রভৃতি।

এবং ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, ভারতের আদিবাসী, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, রঙ্গবল্লী, অমৃত পথযাত্রী।

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল।

কে জানে কোন রূপের কথা গান গেয়ে শুনিয়ে যেত সেই নন্দ বাউল। মাথা দুলিয়ে আর টলে টলে নাচতো নন্দ বাউল। গুনগুন করতো তার হাতের একতারা। গানটা শুনতে ভালই লাগতো, যদিও বুঝতে পারা যেত না, কি বোঝাতে চাইছে গানটা। রূপের আবার সাগর হয় কি করে? হলেও, রূপসাগরের ঘাটটা পিছল হবে কেন? এবং সে পথে চলতে গেলে পা দুটো কেনই বা টলমল করবে? বোধ হয় মস্ত একটা মিস্টিক তত্ত্বের কথা মিষ্টি করে গেয়ে চলে যেত নন্দ বাউল।

সে নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় বেঁচে নেই। আজ নিশীথ রায়ের বয়স ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়ে আরও সাত মাস। নন্দ বাউলকে যেদিন শেষবারের মত দেখেছিল নিশীথ, এবং নন্দ বাউলের গলায় গানটাকেও শেষবারের মত শুনেছিল, সে দিনটি হলো আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগের একটি চৈতালী দিন। নন্দ বাউল তখন সত্তর বছর বয়সের বুড়ো। তার উপর ছিল যক্ষ্মা রোগ। জরা আর যক্ষ্মায় একসঙ্গে মিলে বুড়ো মানুষের সেই ছোট্ট শরীরটাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। সব সময় ধুকপুক করতো নন্দ বাউলের পাঁজরগুলি। হাত-পা কাঠি-কাঠি, ধড়টা ছেঁড়া খড়ের পুতুলের মত, নন্দ বাউলের সেই মূর্তি খালের ধারে একটা কদমের ছায়ার মধ্যে টিনের ছাপর আর বাঁশের বেড়া দেওয়া একটা ঘরের দাওয়ার উপর বসে থাকতো।

কিন্তু নন্দ বাউলের মুখের হাসিকে সেই ভয়ানক জরা আর যক্ষ্মাতেও মেরে ফেলতে পারে নি। নন্দ বাউলের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে সব সময় অদ্ভুত রকমের একটা হাসি ফুটে থাকতো। সেদিনও

নিশীথের চোখের সামনেই সেই হাসিমুখ নিয়ে মাথা দুলিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর একতারা বাজিয়ে রূপসাগরের কথা গেয়ে গেয়ে যেন বিভোর হয়ে গেল বুড়ো বাউলের মর-মর প্রাণটা। গান শেষ করার পর খুব জোরে একবার কেশেছিল নন্দ। মুখ দিয়ে একঝলক রক্তও উথলে পড়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, মুখ ধুয়ে এসে আবার নন্দ তার একতারা কোলের উপর রেখে দাওয়ার উপর চুপ করে বসে রইল। মাথা ঝুঁকিয়ে চোখের সামনের সকলকেই, যেন পৃথিবীর সব আলো ছায়া আর শব্দকে একটা প্রণাম জানালো। আবার ঝিক করে হেসে উঠলো বুড়ো নন্দ বাউলের মুখ।

শুনেছিল নিশীথ, সবাইকে আর সব কিছুকেই প্রণাম করে নন্দ বাউল। কদমের ছায়ার কাছে কোন মানুষ এসে দাঁড়ালেই প্রণাম করে। সে মানুষ কুসুমপুরের নায়েব মশাই হোক আর নৌকাঘাটের মজুর সেলিম শেখ হোক। খালের জলে কচুরী পানার সবুজের মধ্যে যখন নীল ফুল ফোটে, তখন সেই ফুলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে নন্দ। ক্ষেতের উপর ধানের মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে। শালিকের ঝাঁক এসে যখন বাঁশঝোপের ভিতরে কর্কশ স্বরে চেঁচামেচি করে, তখন শুধু সেই শব্দ শুনেই মাথা নীচু করে আর জোড়-হাত বুকে ছুঁইয়ে একটা প্রণাম না করে পারে না নন্দ বাউল।

সেই নন্দ বাউল আজ আর নিশ্চয় নেই। এখান থেকে, কালিকাপুরের এই পাহাড় আর শালবনের ছায়ার কাছ থেকে অনেক দূরে রাজশাহী জেলার কুসুমপুরের খালের কাছে সেই টিনের ছাপরের ঘরটাও আর নেই। সেই কদমের ছায়াটা আছে কিনা কে জানে! কিন্তু সেই নন্দ বাউলকে আজও বার বার মনে পড়ে। তাই নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটাকেও বার বার মনে পড়ে যায়।

কিন্তু মনে পড়ে কেন?

এখানে একটা সেকেলে পুকুর আছে, তার পাথর-বাঁধানো ঘাট এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। কি আশ্চর্য, তিনকড়ি মাহাতো বলেন, এই পুকুরটার নাম রূপসাগর। পুকুরের দক্ষিণ কোণে একটা মন্দির ছিল কোনকালে, সেটাও এখন একটা ভাঙা-পাথরের ঢিপি মাত্র। একটা বুড়ো বটের গোড়ায় সিঁদুর-মাখানো একগাদা নুড়ি পড়ে আছে। রাতের শেয়াল এসে নুড়িগুলিকে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলে যায়। কারা যেন আবার এসে নুড়িগুলিকে গুছিয়ে রেখে দিয়ে যায়। বোধ হয় নিকটের ঐ গাঁয়ের সাঁওতালেরা।

কাল সন্ধ্যাবেলা রেডিওতে ঐ গানটাকেও কে যেন একবার গেয়েছে। অনেকদিন পরে গানটাকে নূতন করে শুনতে বেশ ভালই লেগেছে। এবং ভাবতে গিয়ে মনে মনে একটু লজ্জাও পেয়েছে নিশীথ, গানটাকে যেন আগের চেয়ে আর একটু বেশী ভাল লাগলো, যদিও আজও ঠিক বোঝা যায় না, কি বলতে চাইছে গানটা।

ভাল লাগছে অনেক কিছুই। রাখা পাহাড়ের ঐ গম্ভীর ধোঁয়াটে নীল দেখতে ভাল লাগে। নিকটের শালবনে সারা রাত্তি ধরে একটা ঝড় ছুটোছুটি করেছে। শালের কাঁচা আঠার গন্ধ এখনও বাতাসে ভেসে আসছে। লাল মাটির উপর দিয়ে কন্টিকারীর একটা আঁকা-বাঁকা ঝোপ অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ঝোপের ছায়ায় খরগোস দৌড়ায়। আর একটু দূরে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে টবের ট্রেন। ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর রঙীন মাটি টবে বোঝাই করছে কুলির দল। কুলিদের গান শোনা যায়। শুনতে ভালই লাগে।

কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের এই ছোট বাঙলো-বাড়িটাও আজ নানারকম মিষ্টি কলরবে ভরে গিয়েছে। ঘাটশিলা থেকে এসেছেন কাকিমা আর কাকিমার ভাই নরু মামা। মুসাবনি থেকে এসেছেন জেঠামশাই। মৌভাণ্ডার থেকে এসেছে নিশীথের দুই খুড়তুতো ভাই—দেবেশ আর চঞ্চল। মুসাবনিতে জেঠামশাই-এর

কাছে থাকে নিশীথের আপন বোন বেণু; দশ বছর বয়সের বেণু; সে-ও এসেছে! জ্বর হয়েছে, তবুও এসেছে। ঐ বেণুকে বড় ভালবাসেন জেঠামশাই। বেণু যে এই জেঠামশাইকেই বাবা বলে ডাকে। সেই যখন মাত্র এক বছর বয়স বেণুর, এক মাসের মধ্যে নিশীথের বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন, তখন থেকে বেণু জেঠামশাই-এর কাছেই আছে।

জেঠামশাই বললেন—বেণুটা ভয়ানক কান্নাকাটি করলো, অগত্যা নিয়ে এলাম।

কাকিমা বললেন—এনে ভালই হয়েছে। এত কাছে থেকেও দাদার বিয়েটা দেখবে না মেয়েটা, সে কেমন কথা?

জেঠামশাই একবার চোখ মুছলেন। কেন, অনুমান করতে পারে নিশীথ। জেঠামশাই বোধ হয় তাঁর বড় আদরের ভাই সেই নীরেন আর ভ্রাতৃবধূ মায়ালতার কথা ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন জেঠামশাই—আজ তোর বিয়ে, কিন্তু আজ যারা সবচেয়ে বেশী আনন্দ করতো, তারা দু'জনেই যে নেই। আমার যে একটুও ভাল লাগছে না, নিশি!

জেঠামশাই-এর কথায় ঘরের বাতাসও যেন একটু ব্যথিত হয়। কাকিমা চুপ করে আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। জেঠামশাই নিজেই আবার চেঁচিয়ে হেসে উঠে সবাইকে ব্যস্ত করে তোলেন—কই, কোথায় গেল সব? দেবেশ আর চঞ্চল কোথায়? ফুলের ঝুড়িটা কোথায় রাখলে নরু? বেণু, এদিকে আয় দেখি, বেশ মিষ্টি করে একটা গান গেয়ে নে, তারপর রওনা হয়ে যাই।

মীরাকে প্রভু পরম মনোহর···বেণুর গান প্রায় শেষ হয়ে আসে। নরুমামা ফুলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে তৈরী হলেন। দুটো মোটরগাড়ি অনেকক্ষণ আগেই তৈরী হয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিল। একটা নিশীথের নিজের গাড়ি, আর একটা কণ্ট্রাক্টর জানকীবাবুর।

এখন মাত্র সকাল আটটা, কালিকা মাইনস-এর শেষ খাদের সীমা পার হলেই যে লালমাটির কাঁচা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে সোজা গালুডি। তারপর পাকা সড়ক ধরে টাটা হয়ে একেবারে সিনি। সিনিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপরেই দলমা পাহাড়কে বাঁয়ে রেখে আবার ঘুরে যেতে হবে। টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি, সিনিতে এসে অপেক্ষা করবে। পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইকেও সেখান থেকে তুলে নিতে হবে। তারপর সোজা চাণ্ডিল, এবং চাণ্ডিল পার হয়ে, পুরনো বরাভূমের গড় ছাড়িয়ে রাজপোখরা, যেখানে মহুয়াবনের পাশে অনেকগুলি গালার কারখানা। বাজার আর থানা পার হয়ে, নতুন পটারি আর রোমান-ক্যাথলিক আশ্রম ছাড়িয়ে যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর বাগান নিয়ে ছোট একটি সৌখীন শহর ফুটে রয়েছে, সেখানে একটি বাড়ির ফটকের থামে বাড়ির নামটাও লেখা আছে—অলক্তক। লাক্ষা মার্চেণ্ট শীতলবাবুর বাড়ি।

ছেলেবেলার দেখা সেই নন্দ বাউলের মুখের হাসিটাকেই বোধ হয় আর একবার নিশীথ রায়ের মনের ভিতরে ফুটে ওঠে। রওনা হবার আগে জেঠামশাইকে প্রণাম করে নিশীথ। তার পর ঘরের ভিতরে গিয়ে বাবা আর মার ফটোকেও প্রণাম করে এসে কাকিমাকে প্রণাম করে। প্রণাম করতে ভাল লাগছে। জিওলজির মানুষ নিশীথ রায়; শক্ত পাথর আর মাটির রহস্য ঘাঁটাঘাঁটি করে কালিকা মাইনস-এর যে ম্যানেজারের জীবন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যস্ত হয়ে থাকে, সেই মানুষের মনেও যেন প্রশ্ন জেগেছে। একটা মানুষকে মনেপ্রাণে ভালবাসলে কি পৃথিবীর সব কিছুকেই এমন করে ভাল লাগে?

কাকিমাও হেসে হেসে ঠাট্টা করেন—কি রে নিশি? তোকে যে আজ বড় বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—বউদি নিশ্চয় দেখতে আরও বেশী সুন্দর।

কাকিমা—তাই নাকি রে?

নিশীথ হেসে ফেলে—আমার তো তাই মনে হয়।

গাড়ি দুটোও যেন হেসে উঠে স্টার্ট নিল। কাকিমা আর বেণুকে নিয়ে নিশীথের গাড়িটা আগে আগে, পিছনের গাড়িতে জেঠামশাই ও আর সবাই।

গালুডির কাছাকাছি এসে রেল-লাইনের লেভেলক্রশিং-এর কাছে একবার থামতে হলো। বেণুকে খাওয়াবার জন্য শিশি থেকে গেলাসে ওষুধ ঢালেন কাকিমা, এবং নিজের জন্য ফ্লাস্ক থেকে মিছরি-জল। গাড়ির স্টিয়ারিং দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখে চুপ করে বসে থাকে নিশীথ।

হু হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। নিশীথ রায়ের মনের ভিতরেও একটা লাল মাটির পথের উপর দিয়ে যেন একটা শিহর ছুটে চলে যায়। ঐ তো, ঐরকমই একটি ট্রেন, এবং এই লাইনেই ছুটে চলে যাচ্ছিল সেই ট্রেন। যদি সেদিন সেই ট্রেনের সেই কামরাতে নীরাজিতার সঙ্গে দেখা না হতো, তবে কি আজ নিশীথ রায়ের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছাটা এরকম ব্যাকুল হয়ে রাজ-পোখরা নামে এক লাক্ষানগরের অলক্তকের কাছে এগিয়ে যাবার লগ্ন খুঁজে পেত?

একটা শিপমেন্টের ব্যবস্থা করবার জন্য কলকাতায় এসে পোর্ট-অফিস, কাস্টম-হাউস আর ব্যাঙ্কে পুরো সাতটি দিন ছুটোছুটি করবার পর কালিকাপুরে ফিরবার সময় নাগপুর এক্সপ্রেসের একটা কামরার ভিতরে ঢুকতে গিয়েই পিছ-পা হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল নিশীথ রায়। দরজার পাশে কার্ড ঝুলছে। কার্ডের গায়ে নাম লেখা—নীরাজিতা সরকার। একটা বার্থ রিজার্ভ করেছে কোন এক যাত্রিণী।

'কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল নিশীথ রায়,

এই কামরার ভিতরে ঠাঁই না নেওয়াই বোধ হয় ভাল। তারপর সেই কামরাতেই ঢুকে আর চুপ করে বসে বসে একটা অস্বস্তিও অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছিল। কামরার ভিতরে নিশীথ রায় ছাড়া শুধু ঐ একজনই যাত্রী ছিল, এক তরুণী। যদি ট্রেন ছাড়ার এক মিনিটও আগে বুঝতে পারতো নিশীথ, আর কোন যাত্রী এই কামরাতে উঠবে না, তবে বোধ হয় নিশীথ রায় ঐ হাওড়াতেই সেই কামরা থেকে নেমে অন্য কামরার ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নিত।

শিপমেন্টের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হাজার হয়রানি ভুগে একেই তো মনটা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়েছিল, তারপর এই অস্বস্তি। অচেনা ও অজানা এই তরুণী দেখতে ভাল হলেই বা কি আসে যায়? ভদ্রভাবে একটা কথা বললে ভদ্রভাবে উত্তর দেবে কিনা কে জানে? নিজের থেকে যেচে আলাপ করবে বলেও মনে হয় না। একই কামরার ভিতরে দুটো মানুষ শুধু চুপ করে থাকবে, এটাও যে একটা দুঃসহ অভদ্রতার ব্যাপার। মহিলার মনের রীতি-নীতিই বা কেমন, কে জানে? হয়তো নিশীথের চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টিকেই লোভীর দৃষ্টি বলে মনে মনে সন্দেহ করবে, আর সেই গর্বে বিভোর হয়ে বসে থাকবে মহিলা। ইচ্ছে করে নিজেকে এভাবে কারও মনের ভিতরে লাঞ্ছিত হতে দেবার সুযোগ দিয়ে লাভ কি?

কিন্তু খড়গপুরে এসে ট্রেনটা থামলেও এবং অন্য কামরায় চলে যাবার জন্য চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারেনি নিশীথ। আজ মনে পড়ে, এবং মনে পড়তেই লজ্জাও পায় নিশীথ, নীরাজিতার মত মেয়েকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও সেদিন মনের ভুলে কি ভয়ানক অস্বস্তিই না মিছামিছি পুরো দুটি ঘণ্টা সহ্য করতে হয়েছিল!

ছোট স্যুটকেশ আর বেডিংটা নিজেই হাতে তুলে নিয়ে কামরা থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেয়েছিল নিশীথ। বাধা দিল নীরাজিতা।

—আপনি কি এখানেই নামবেন?

অপরিচিতার হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠে উত্তর দেয় নিশীথ। —না আমি এখন যাব টাটানগর।

অপরিচিতা বলে—তবে এখানে নামছেন কেন?

—অন্য কামরায় সীট আছে বোধ হয়।

—অন্য কামরায় যাবেন কেন?

—যাচ্ছি···মনে হচ্ছে, আপনার বোধহয় খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

—আপনি খুব ভুল বুঝেছেন। বরং, আপনি অন্য কামরায় চলে গেলে আমার পক্ষে একলা এই কামরাতে থাকতে কি রকম অস্বস্তি হতে পারে, বুঝে দেখুন।

নিশীথ রায়ের চিন্তার এতক্ষণের ভুলটাই লজ্জিত হয়। —তাই তো, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমি অতটা ভেবে দেখিনি।···আপনি কোথায় যাবেন?

—আমিও যাব টাটানগর।

—আপনার বাড়ি টাটানগর?

—না সাকৃচিতে আমার মামা থাকেন। আমাদের বাড়ি আরও দূরে।

—রায়পুরে বোধ হয়?

—না, অত দূরে নয়; ওদিকেও নয়। আমাদের বাড়ি সিনি থেকে সামান্য দূরে, রাজপোখরার কাছে।

—সেই লাক্ষানগরের কাছে বোধ হয়?

—লাক্ষানগরেই। আমার বাবার গালার কারবার আছে।

—আপনার বাবার নাম?

—শীতলচন্দ্র সরকার।

—তাই বলুন, তিনি তো আমাদের গালুডির ধীরেনবাবুর কাকা।

অপরিচিতার চিন্তান্বিত চেহারাটা এতক্ষণে যেন একটু সুস্মিত

হয়ে ওঠে। —হ্যাঁ। ধীরেনদা'র সঙ্গে আপনার চেনাশোনা হলো কেমন করে?

—আমিও যে গালুডির কাছেই কালিকাপুরে থাকি।

—কালিকাপুর? যেখানে ফায়ার-ক্লে, কেওলিন আর...

—আর ম্যাঙ্গানিজও কিছু কিছু আছে। আমি কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজারী করি।

আরও আস্বস্ত হয় এবং একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ওঠে তরুণী। —তাহলে মুসাবনির ডাক্তার হরদয়ালবাবু হলেন আপনার...

—আমার জেঠামশাই তাঁকে চেনেন নাকি?

—খুব চিনি। তিনি তো প্রায়ই সাকৃচিতে আমার মামার বাড়িতে আসেন, তিনি আমার মামার বন্ধু। তিনিই একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর এক ভাইপো কালিকা মাইনস-এ ম্যানেজারের পোস্টে আছে। কিন্তু...

নীরাজিতার কথার আবেগ হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু কি? ডাক্তার হরদয়ালবাবুর মুখ থেকে শোনা কোন একটা কথা একেবারে স্পষ্ট করে মনে পড়ে গিয়েছে বলেই বোধ হয় থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে নীরাজিতা; ভাইপো বিয়ে করতে চায় না, হরদয়ালবাবুর সেই অভিযোগ নীরাজিতার মত এক অনাত্মীয়া ও বিনা-সম্পর্কের মেয়ের মুখের ভাষায় মুখর হয়ে উঠতে পারে না। নীরাজিতার পক্ষে সে কথা আলোচনা করা অশোভন তো বটেই, নির্লজ্জতাও নিশ্চয়।

নিশীথ রায় হঠাৎ হেসে ফেলে—বুঝেছি, জেঠামশাই-এর মুখে আমার নামে ভয়ানক কোন অভিযোগ শুনেছেন।

রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে নীরাজিতা হাসতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টাটাই যেন ব্যর্থ হয়ে নীরাজিতার মুখের উপর একটা লাজুক গম্ভীরতার আভা ফুটিয়ে তোলে! নীরাজিতা বলে—হ্যাঁ, অভিযোগই বটে...তার মানে, জেঠামশাই-এর কোন কথা আপনি

কানেই তোলেন না, আর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চান।

নিশীথ বলে—ঠিকই শুনেছেন। কালিকাপুর জায়গাটা সুন্দর; কাজটাও মন্দ নয়; বেশ ভালই লাগে। কিন্তু···

নিশীথ রায়ের কথার আবেগও হঠাৎ মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নীরাজিতার চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, নিশীথ রায়ের মুখ থেকে ঐ কিন্তুর উত্তর শোনবার জন্য ওর মনের ভিতরে একটা কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আনমনার মত, এবং কেমন একটু বিব্রতভাবে বিড়বিড় করে ওঠে নিশীথ রায়—কিন্তু ওখানে একা-একা পড়ে থাকতে আজকাল বেশ ভয় করে।

নীরাজিতা হাসে। জায়গাটা—খুব বেশী জংলা বোধ হয়।

অপ্রস্তুত হয়ে যেন নিজের মনের একটা অসতর্ক বাচালতাকে শুধরে দেবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—না না, সে সব ভয় নয়। জঙ্গলটাই তো সবচেয়ে সুন্দর।

প্রথম আলাপের ভাষাটা সেদিন তরতর করে তরল স্রোতের মত এইভাবে স্বচ্ছন্দে অজস্র প্রশ্ন আর কৌতূহলের কলরব নিয়ে এই পর্যন্ত এসে কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক পিছনে পড়ে আছে খড়গপুর। ট্রেন তখন রাতের ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে! বাইরের বাতাস বৃষ্টিতে ভিজছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছোট ছোট ঝাপটা কামরার ভিতরে এসে ছিটকে পড়ে। এবং এতক্ষণ পরে এই ক্ষণিক নীরবতার মধ্যে নিশীথের চোখদুটো স্পষ্ট করে দেখবার সুযোগ পায়, আনমনার মত জানালা দিয়ে বাইরের বর্ষাসিক্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে নীরাজিতা। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, একটা অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে নীরাজিতার মুখের উপর। এবং সেই মুখটি দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর।

রাতের আকাশের মেঘ কখন ফুরিয়ে গিয়েছে, বাইরের বাতাসের

বৃষ্টি-ভেজা শিহর কখন থেমে গিয়েছে, বুঝতে পারেনি নিশীথ। বুঝলো তখন, যখন আর একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় নিশীথ, জানালার কাছে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে আকাশের একটুকরো চাঁদের স্নিগ্ধ চেহারাটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা।

তবে কি কবিতা লেখার অভ্যাস, কিংবা ছবি আঁকার সখ আছে নীরাজিতার? হতে পারে। কিন্তু নীরাজিতা নিজে বোধ হয় এখন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারছে না যে, এই চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতরে একটা মানুষের উৎসুক চোখের বিস্ময়ের সামনে ওর নিজের চেহারাটাই সুন্দর একটা কবিতার ছবি হয়ে ঢলঢল করছে। যেখানে থাকে নীরাজিতা, রাজপোখরা নামে সেই লাক্ষা নগরকেও একটা রূপকথার দেশ বলে মনে হয়।

—আপনি কি প্রায়ই এই পথে যাওয়া -আসা করেন?

নিশীথের প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নীরাজিতা। উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

—এইরকম একা-একা?

নীরাজিতা হাসে—না, আজই এই প্রথম। ছোটকাকার ব্লাড-প্রেসারের কষ্ট হঠাৎ বেড়ে গেল, তাই তিনি সঙ্গে আসতে পারলেন না। অথচ আমাকে যেতেই হবে, কালকেই বড়দির ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন আছে। কাজেই বাধ্য হয়ে···

—কলকাতাতে আপনার প্রায়ই যেতে হয়, তার মানে আপনি স্টুডেন্ট?

—এখন আর নয়।

—তার মানে?

নীরাজিতা হাসে—বাবার ইচ্ছে, মেয়েকে অনর্থক আর বেশী পড়িয়ে কষ্ট দিতে তিনি রাজী নন। তাই ফিফ্থ-ইয়ারও শেষ করবার সুযোগ পেলাম না।

—এটা কিন্তু ভাল হলো না। ফিফ্‌থ-ইয়ারে এসে পড়া ছেড়ে দেবার কোন অর্থ হয় না।

নীরাজিতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাবা বলেন, তোকে তো আর ফরেস্ট-অফিসার হয়ে জঙ্গলে থাকতে হবে না, এত বোটানি চর্চা করে লাভ কি ?

নিশীথও উৎসাহিত হয়ে বলে—আপনি বোটানি পড়েন ?

—হ্যাঁ।

—অনার্স কোর্স ?

—হ্যাঁ !

নিশীথ হাসে—আমি জিওলজি।

ট্রেনের কামরার আলোকিত নিভৃতের নীড়ে এতক্ষণে দু'টি অপরিচিতের খোলা মনের হাসি যেন ঘরোয়া জানাজানির পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর ভয় নয়, অস্বস্তিও নয়। এবং আলাপের ভাষাও যেন এই ক্ষণিক পুলকের ভুলে আরও অবাধ হয়ে যায়।

নিশীথ বলে—একটা কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, আপনার বাবা কেন হঠাৎ আপনাকে পড়া থেকে ছাড়িয়ে···

হঠাৎ মাথা হেঁট করে নীরাজিতা, আবার একটা অস্বস্তির ছায়া নীরাজিতার মুখের উপর ছটফট করতে থাকে। ছায়াটা ভীরু ; কিন্তু সেই ভীরুতাটা বড় মিষ্টি।

নিশীথ বলে—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। বোধ হয় আপনার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

কোন কথা না বলে শুধু আস্তে একবার মাথাটা দুলিয়ে উত্তর দেয় নীরাজিতা—না।

—তাহ'লে বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে বোধ হয়।

কোন উত্তর দেয় না নীরাজিতা। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা নেই, নীরাজিতার ঐ হেঁটমাথা আর নীরবতা কি কথা বলতে চাইছে।

রাতের ট্রেন ফিকে জ্যোৎস্না গায়ে জড়িয়ে আপন মনের উল্লাসে

হু হু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। চাকুলিয়া ছেড়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ ধলভূমগড় আর ঘাটশিলাও পার হয়ে গেল। খোলা জানালার উপর হাত রেখে, এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে নীরাজিতা। তবু দেখতে পায় নিশীথ, নীরাজিতার সেই বন্ধ চোখের পাতায় যেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করছে। নিশীথের বুকের ভিতরে সব নিশ্বাস একসঙ্গে চমকে উঠে এলোমেলো হয়ে যায়। কি ভাবছে নীরাজিতা? হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন নীরাজিতা? চোখে জল কেন? নীরাজিতার চোখদুটো কি সত্যিই নিশীথের মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছাটাকেই দেখে ফেলতে পেরেছে?

গালুডিও বোধ হয় পার হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পায় নিশীথ, টাটার ব্লাস্ট-ফার্নেস-এর রক্তাভা ফুটে থাকে যে আকাশে, সেই আকাশটা বড় কাছে চলে এসেছে। টাটানগর পৌঁছতে আর দেরি নেই।

চুপ করে, এবং একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে নিজেরই মনের একটা ছন্নছাড়া তুমুল অস্বস্তির বেদনার সঙ্গে লড়াই করে নিশীথ রায়। জিওলজির পাথুরে কঠোরতা যেন ছোট একটা বনলতার মায়ার কাছে বারবার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ডাক দেয় নিশীথ রায়—শুনছেন, টাটানগর এসে পড়েছে।

চমকে উঠে মাথা তুলে তাকায় নীরাজিতা।—কি বললেন?

—টাটানগর।

হাঁপ ছাড়ে নীরাজিতা—ও, তাই বলুন!

—আপনি কি এত রাত্রে একাই সাক্‌চি যাবেন?

নীরাজিতা হাসে—না, তা কেন হবে? মামার গাড়ি নিশ্চয় স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে।

—আর একটা কথা—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ রায়।

ট্রেনটা একটু মৃদুগতি হয়ে, যেন একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টার আনন্দে অলস হয়ে প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে চলেছে। আর কয়েকটি মুহূর্ত পরে, নীরাজিতা নামে সেই সুন্দর ছবি, ছোট বনলতার মায়ার মত স্নিগ্ধতার এই রূপ, এই ঢিলে খোঁপা ও গলার এই চিকচিকে সুতলী-হার, আর, মুগার-কাজ-করা এই রঙীন শাড়ির আঁচল এই রাতের আলোছায়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

নীরাজিতাও যেন দম বন্ধ করে দু'চোখের ভীরু বিস্ময় অপলক করে নিশীথ রায়ের সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিশীথ বলে—আপনাকে যদি চিঠি লিখি, তবে··· ?

—লিখবেন।

—কোন আপত্তি নেই তো ?

—না।

—ঠিকানাটা ?

—নীরাজিতা সরকার, অলক্তক, রাজপোখরা, মানভূম।

গরম হাওয়ার ছোঁয়ায় নিশীথের গাড়ির স্টিয়ারিং বেশ তেতে উঠেছে। টাটানগর ছেড়ে আসা হয়েছে অনেকক্ষণ। পথের দু'পাশে নেড়া ও রুক্ষ চেহারার পাথুরে ডাঙা। রোদের জ্বালা ভেদ করে পীচ-ঢালা সড়কের আলগা ধুলো উড়িয়ে নিশীথ রায়ের গাড়ি নিজের মনের উল্লাসে ছুটে যেতে থাকে। সিনিও বোধ হয় আর খুব বেশী দূরে নয়।

পথের দু'পাশে একটা গাছের ছায়াও নেই। পৃথিবীটা এখানে তার কোটি বছর আগের সেই শ্যামলতাহীন কঠিন চেহারার গর্ব নিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে। সড়কের দু'পাশের ডাঙা যেন সেকেলে জড়ের প্রকাণ্ড শিবির। শুধু পাথর আর পাথর ; এবড়ো-খেবড়ো চাপ-চাপ, তাল-তাল ; আবার থরেথরে সাজানো ; যত নিরেট ও কঠোর ধূসরতা। রোদের জ্বালায় মুগ্ধ হয়ে ডাঙার সারা বুক জুড়ে

ঝিকঝিক করে হাসছে অজস্র অভ্রের কুচি। অনেক দূরে সেরাই-কেলার রিজার্ভ জঙ্গলের সীমানা একটুকরো মেঘাভ ছায়ার আলপনার মত দেখা যায়।

কাকিমা বলেন—ইস, কি বিশ্রী শুকনো জায়গা রে নিশি! একটু ঘাস পর্যন্ত নেই।

নিশীথ হাসে—এই তো পৃথিবীর বনেদী চেহারা, কাকিমা।

কাকিমা—কি ভয়ানক বনেদী চেহারা রে বাবা!

—তুমি বলছো ভয়ানক, কিন্তু আমাদের কালিকা-মাইনস-এর মালিক রবার্টসন কি বলে জান?

—কি?

—স্টোনী গ্রেভ অব এ প্যারাডাইস। একটা স্বর্গের পাথুরে কবর। রবার্টসন প্রায়ই এখানে এসে এই ডাঙার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। জায়গাটা লীজ নেবার জন্য দিন রাত কি চেষ্টাই না করছে বেচারা!

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—কি? কিসের গল্প বলছো দাদা?

নিশীথ হাসে—আমি বলছি পাথুরে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প! এখানে সীসা আছে, তামা আছে, বেণু! সোনাও থাকতে পারে। তা ছাড়া, আমিও একদিন এই ডাঙার ঐ পুবদিকের একটা শুকনো ঝরনার বালি খুঁড়ে খুব সুন্দর একটা গন্ধ পেয়েছিলাম।

কাকিমা হাসেন—প্যারাডাইসের ফুলের গন্ধ?

—গন্ধকের গন্ধ। কিন্তু রবার্টসন স্বপ্ন দেখেছে, পেট্রল আছে এখানে।

বেণু বলে···একটু বউদির গল্প বল না, দাদা!

হেসে ফেলে, এবং গল্পই বন্ধ করে দেয় নিশীথ। কাকিমাও হেসে বেণুকে আশ্বস্ত করেন—আর একটু পরে বউদিকে তো দেখতেই পাবি। ঝুনু-মাসির চেয়েও সুন্দর, কি চমৎকার একটা বউদি!

বাড়িয়ে বলেননি কাকিমা, ঠিকই অনুমান করেছেন। কাকিমার বোন ঝুনু-মাসির চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর নীরাজিতা। তবু তো কাকিমা আরও অনেক কিছুই জানেন না। কেন সেদিন সেই ট্রেনের কামরার জানালায় হাত রেখে, এবং সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়ে নিঝুম হয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল নীরাজিতা, সেকথা কাকিমা জানেন না। নীরাজিতার বন্ধ চোখের পাতায় সেদিন কেন ভেজা জ্যোৎস্নার রেখা চিকচিক করে উঠেছিল, সেকথা প্রথম চিঠির ভাষাতেই জানিয়ে দিতে ভোলেনি নীরাজিতা : যার মুখের দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছা করছিল, অথচ তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, এবং যাকে আর জীবনে কোনদিন চোখে দেখবারও সুযোগ হবে না জানতাম, সেই মানুষ চোখের কাছেই বসে আছে, এমন অবস্থায় পড়লে অন্তত আমার মত কোন মেয়ের চোখ কি একটু না ভিজে থাকতে পারে, বলুন?

নীরাজিতার শেষ চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে : আর এভাবে দূর থেকে শুধু ভালবাসার কথা লিখে লিখে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। অলক্তকের মেয়েকে যদি ভাল লেগে থাকে, তবে সোজা চলে এসে তার হাত ধরে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাও।

এর পর বোধ হয় দুটো সপ্তাহও পার হয়নি। জ্যেঠামশাই-এর কাছে চিঠি দিয়েছিল নিশীথ, এবং শীতলবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন জেঠামশাই। জেঠামশাই-এর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রথম চিঠিতেই নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ের কথা এবং বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেললেন শীতলবাবু। নিশীথও শীতলবাবুর কাছ থেকে আকুল আশীর্বাদে মুখর একটি চিঠি পেয়েছিল : আমার বড় আদরের মেয়ে নীরাকে তোমারই হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, নিশীথ!

অনেকগুলি গাছের ছায়া কাছে এসে পড়েছে। অনেকগুলি যজ্ঞডুমুর আর ঘোড়ানিমের একটা জটলা। টু সিনি—সেভেন

মাইলস্। পথের পাশে কাঠের পোস্টে লেখা সঙ্কেত চোখে পড়তেই গাড়ির স্পীড মৃদু করে দেয় নিশীথ। এই তো, এখানে এসে খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি অপেক্ষা করবে বলে কথা আছে, এবং পুরুত-মশাইও।

কিন্তু শুধু চক্রবর্তী মশাই একাই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। বিভূতি আসতে পারেনি। একঝুড়ি ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে বিভূতি। একগাদা স্থলপদ্ম আর হলুদে গোলাপ। চক্রবর্তী মশাই বললেন— বিভূতিবাবু আসতে পারলেন না, তিনি খুবই দুঃখিত। খুব জরুরী কাজে আটক হয়ে পড়েছেন।

খবর শুনে নিশীথের এত হাস্যোজ্জ্বল মুখের শোভাও যেন ব্যথিত হয়ে ওঠে। নিশীথের বন্ধু বলতে বোধহয় ঐ একজনই বন্ধু আছে, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজ-এর বিভূতি। নিশীথের বিয়েতে বিভূতি আসতে পারলো না, জেঠামশাইও দুঃখিতভাবে বলেন—বোধ হয়, সত্যিই খুব জরুরি কাজ, আসবার কোন উপায়ই নেই, নইলে বিভূতি কি নিশির বিয়েতে না এসে পারতো?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ। কাকিমা বলেন—এখানে আর রেস্ট নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, নিশি। বরং বেলা থাকতেই রাজপোখরা পৌঁছে যাওয়া ভাল।

দুটো গাড়ি আবার একসঙ্গে স্টার্ট নিয়ে ছায়া-কুঞ্জের স্নিগ্ধতার ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

ধূলিধূসর দুটো মোটরগাড়ি যখন উৎফুল্ল কলরবের সম্ভার নিয়ে অলক্তকের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ির সব বালুকণা বিকালের আলোতে সোনার মত জ্বলছে।

রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের চেহারাও অদ্ভুত। এই বিকালের আলোতেও একটা বিরাট নিদমহলের মত মনে হয়। ঝাউএর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় ফটক, প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড বাগান সবই নীরব। গালার কারখানাগুলিও বড় শান্ত, কারখানা বলেই মনে হয় না। সাড়া-শব্দ যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে এই সারি-সারি ঝাউ-এর অবিরাম কাতর স্বরের উচ্ছ্বাসে সে সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়, মানুষ আছে; অনেক সৌখীন মানুষের জীবন এখানে শান্ত বৈভবের মধ্যে নীড় রচনা করে রয়েছে। কোন বাড়ির বারান্দায় বড় বড় অ্যালসেশিয়ান, কোন বাড়ির বারান্দার সামনে হাল মডেলের মোটরগাড়ি। কোন বাড়ির লন-এর চারদিকে অজস্র ডালিয়ার ভিড়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী শান্ত, একেবারে নিস্তব্ধ এই অলক্তক। আগন্তুক দুটি মোটরগাড়ির হর্ন অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার বেজেছে। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অলক্তকের বুকে কোন চাঞ্চল্যের শব্দ বেজে ওঠে না।

জেঠামশাই বিরক্ত হয়ে বলেন—এ কি-রকমের ব্যাপার হলো, নিশি? ফটকে তালা ঝুলছে কেন?

অলক্তকের বন্ধ ফটকের ঐ তালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল নিশীথ। এবং বুঝতেও পারছিল নিশীথ, তার চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা উত্তাপের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে। এমন ভয়ানক বিদ্রূপও কি পৃথিবীতে থাকতে পারে? নিশীথ রায়ের জীবনের প্রথম ভালবাসার অলক্তক পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেল কেন?

অলক্তকের ফটকে আমপাতার ঝালর দুলছে। দেখে বোঝা যায়, পুরনো দিনের কোন উৎসবের আমপাতা নয়। টাটকা সবুজ আমপাতা; আজই, বোধ হয় কয়েক ঘণ্টা আগে এই ফটকের রূপ টাটকা সবুজ দিয়ে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। অলক্তকের প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া ও মসৃণ মোজেয়িক-এর বারান্দাটাকেও এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। বেণু চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ যে, বারান্দাতে কি সুন্দর আলপনা আঁকা হয়েছে কাকিমা!

অলক্তকের জীবনে উৎসবের লগ্ন দেখা দেবার আগেই যেন হঠাৎ

ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে গিয়েছে অলক্তকের প্রাণ। উৎসবের আম-পাতা আর আলপনাকে জঞ্জালের মত ফেলে রেখে দিয়ে বাড়ির মানুষগুলি কোথায় যেন চলে গিয়েছে। কেন? কিসের জন্য? কিন্তু বাড়ির মালীটা পর্যন্ত নেই; একটা কথা বলে এই দুঃসহ বিস্ময়কে একটু করুণা করবার জন্যও কেউ এখানে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। একটা নির্মম রহস্যকে শুধু তালা দিয়ে বন্ধ করে ফটকের বুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে, নিজেরই বুকের ভিতরে যেন আঁচড়ে আঁচড়ে এই এক মাসের ইতিহাস, আর নীরাজিতার চিঠির লেখাগুলিকে খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকে নিশীথ। কই? তার মধ্যে তো নীরাজিতার এক বিন্দু সন্দেহ, এবং এক তিল আপত্তির একটা ছায়াও ছিল না। নীরাজিতার মনের কথা, শীতলবাবুর চিঠির কথাগুলিও মনে পড়ে। শীতলবাবু তো শেষ চিঠিতে নিশীথকে একেবারে প্রাণখোলা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন: শুভ কাজে আর দেরি করতে চাই না। এই মাসের কোন ভাল দিনে বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল।

মিথ্যা, ভয়ানক মিথ্যা নন্দ বাউলের মুখের সেই হাসিটা! মনে পড়ে নিশীথের, রূপসাগরের কথা গাইতে গিয়ে নন্দ বাউলের বুকের ভিতর থেকে এক ঝলক কাঁচা রক্ত উথলে পড়েছিল। নিশীথ রায়ের মনে হয়, তারও বুকের ভিতর নিশ্বাসটা বোধহয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

জেঠামশাই বলেন—কি আশ্চর্য, শীতল সরকারের কি মাথা খারাপ হলো?

কাকিমা বলেন—বিয়ের তারিখটা জানতে তোর কোন ভুল হয় নি তো নিশি?

নিশীথ বলে—না।

—এঁরা কোন ভুল করলেন না তো?

—না, এঁরা কালকেও টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছেন,

আমিও টেলিগ্রামে উত্তর দিয়েছি। ভুল হবার কোন কারণ নেই।

কাকিমা করুণভাবে বলেন—তবে?

—তবে এখনো বুঝতে তোমরা ভুল করছো কেন কাকিমা?

—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

—এই বিয়েতে এঁদের আপত্তি আছে।

কাকিমা রেগে চেঁচিয়ে ওঠেন—আপত্তি? কি এমন মস্ত মানুষ শীতল সরকার, আর তার মেয়েই বা কি এমন দেবীটি?

হেসে ফেলে নিশীথ রায়!—এখানে দাঁড়িয়ে, এরকম রেগে আর চেঁচিয়ে নিজেকে অপমান করে লাভ কি কাকিমা? চল, আর দেরি না করে ফিরে যাই।

জেঠামশাই ধীরে ধীরে হেঁটে আবার গাড়ির ভিতরে উঠে বসেন। চঞ্চল আর দেবেশ গম্ভীর হয়ে গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে অলক্তকের দিকে যেন ওদের রুষ্ট চোখের সব আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বেণু কেঁদে ফেলে। কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন—ফিরে চল, নিশি।

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে এইবার সন্ধ্যা নামবে। বিকালের শেষ আলোতে রঙীন হয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখার স্রোত নুড়ি আর বালুকণা। দূরের দলমা পাহাড়ের গায়ে ছায়ার রেখাগুলি কালো হয়ে এসেছে। লাক্ষানগরের ঝাউ-এর সারির ছায়া থেকে পালিয়ে যাবার জন্য যেন ছটফট করে স্টার্ট নেয় দুটি ধূলিধূসর মোটরগাড়ি।

কিন্তু গাড়ি দুটো হঠাৎ একটা ইশারার বাধা পেয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার ওপারের একটি ছোট বাঙলো বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। বার বার হাত তুলে ইশারায় থামতে বলছেন ভদ্রলোক। ঐ বাঙলোর চারদিকে ডালিয়ার ভিড় জঙ্গলের মত ঘন হয়ে রয়েছে। বেণু লোভীর মত চেঁচিয়ে ওঠে—কী সুন্দর ডালিয়া!

প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। ইনিও বোধহয় একজন লাক্ষা

মার্চেন্ট। মোটা শরীর, ঢিলে গেঞ্জি, ঢলঢলে পায়জামা, এবং গায়ে একটি চাদর। ভদ্রলোকের মুখটা যেন খুব বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। হন-হন করে হেঁটে এসে সোজা জেঠামশাই-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক হাতজোড় করে অনুরোধ করেন—যদি কিছু না মনে করেন, তবে গরীবের বাড়িতে একবার আসুন! একটু বিশ্রাম করে তারপর যাবেন।

জেঠামশাই বিব্রতভাবে হাসেন—মাপ করবেন, আমরা একেবারে সিনিতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করবো।

ভদ্রলোক বলেন—আমার অনুরোধ রাখলে বড় খুশি হতাম। শুধু দশ মিনিটের মত একটু জিরিয়ে নিয়ে, সামান্য একটু চা ইত্যাদি···

জেঠামশাই একটু বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন—আপনারা এভাবে চলে যাবেন, ব্যাপারটা দেখতে বড়ই খারাপ লাগছে বলে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে চাইছি—

জেঠামশাই গাড়ি থেকে নামেন। ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে চঞ্চল আর দেবেশকেও ডাকাডাকি করেন—চল বাবা, সবাই চল। বেণুকে হাত ধরে বলেন—চল মা, আমার ডালিয়া দেখবে চল। কাকিমার সামনে গিয়ে বিনীতভাবে হাতজোড় করেন—আসুন!

ভদ্রলোকের আহ্বানের টানে সকলেই সেই ছোট বাঙলো-বাড়ির দিকে, সেই ডালিয়ার ভিড়ের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে। শুধু চুপ করে একা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দলমা পাহাড়ের বুকের কালো-কালো ছায়ারেখার দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ভদ্রলোক নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে বলেন—আপনিও চলুন।

—একটা কথা বলবেন?

—বলুন।

—আপনার প্রতিবেশী এই শীতলবাবুদের ব্যাপারটা কি?

ভদ্রলোক বিপন্নের মত তাকিয়ে থাকেন—আমাকে বৃথা এসব প্রশ্নের মধ্যে টানবেন না। আমার কোন কথা বলা উচিত নয়।

—বলুন, আমি কিছুই মনে করব না।

—বিয়ের সবই তো ঠিক ছিল। কিন্তু আজ দুপুরেই কোথা থেকে একটা খারাপ সন্দেহের খবর কে যেন এসে দিয়ে গেল, তাই ওঁরা খুব বেশী ভয় পেয়ে গেলেন। কাজেই, অর্থাৎ, বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কোন উপায় ছিল না বলেই, তার মানে, চক্ষুলজ্জার ভয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে গিয়েছেন।

—কিসের সন্দেহ?

—শীতলবাবু খবর পেয়েছেন যে, পাত্রের…

—বলুন!

—পাত্রের চরিত্র খারাপ।

ভদ্রলোক যেন নিজেরই মুখের ঐ ছোট্ট একটি কথার শব্দ শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। চুপ করে নিশীথের গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই ব্যস্তভাবে গায়ের চাদর টানাটানি করে নিজেরই এই অপ্রস্তুত অবস্থার অস্বস্তিটাকে সামলাবার চেষ্টা করেন। তারপরেই উৎসাহিত স্বরে, এবং প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।—থাকগে, যেতে দিন, এসব বাজে কথা আমাদের আলোচনা করাই উচিত নয়। মোট কথা…

নিজের কথার ঝোঁক হঠাৎ সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন—আপনি তাহ'লে এখানেই বিশ্রাম করুন।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। নিশীথ তেমনই গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঝাউ-এর শব্দের সঙ্গে নিজেরও আহত নিঃশ্বাসের ছোট ছোট শব্দগুলিকে মিশিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকে, দলমা পাহাড়ের গায়ে

ছায়ার রেখা আরও ঘন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরি নেই।

নন্দ বাউলের সেই গানটার অর্থ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল, চলতে গেলে পা টলমল করে ওঠে। এবং আছাড় খায় তারাই, যারা বড় বেশী মুগ্ধ হয়ে, খুব বেশী ভালবেসে, আর হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পা টলমল করতো না, আছাড় খেয়ে পড়ে যেতেও হতো না, যদি আগে একটু ধুলো ছড়িয়ে দিতে পারা যেত। একটু ফাঁকি, একটু চালাকি, আর বেশ একটু বাজে অহঙ্কারের ধুলো।

নন্দ বাউলের গানটাই শুধু নয়, ছেলেবেলার একটা পরীক্ষার কথাও মনে পড়ে। সেটা ছিল ডিক্টেশন অর্থাৎ শ্রুতিলিখনের পরীক্ষা। নিশীথের খাতাটাকে শক্ত করে খিমচে ধরে লেখাগুলিকে ছু'বার পড়েছিলেন সেই বৈদ্যনাথ স্যার; সেই মস্তবড় টাক আর মস্তবড় একজোড়া গোঁপ। নিশীথের লেখার মধ্যে একটাও বানানের ভুল খুঁজে পেলেন না বৈদ্যনাথ স্যার। পেনসিলের শীষ ঘষে-ঘষে খুব সরু আর তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আর একবার খাতাটাকে খিমচে ধরলেন। লেখাটাকে আবার পড়লেন। ভ্রূকুটি করে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বারো বছর বয়সের নিশীথের মনের ভিতরে যেন মস্ত একটা আশার চাঁদ ঝকমক করে ফুটে ওঠে। এইবার দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়ে ফেলবেন বৈদ্যনাথ স্যার। না দিয়ে পারবেন কেন? বৈদ্যনাথ স্যারের ঐ তীক্ষ্ণমুখ পেনসিল নিশীথের লেখার উপর একটাও আঁচড় দিতে পারেনি। সেই মুহূর্তে চমকে উঠেছিল নিশীথ, বারো বছর বয়সের সেই আশার চাঁদ যেন দপ করে নিভে গেল। বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিল অদ্ভুত এক আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত লেখাটাকেই একটানে কেটে দিয়ে একটা শূন্য বসিয়ে দিল।

বৈদ্যনাথ স্যারের সেই তীক্ষ্ণমুখ পেনসিলের রাগের অর্থ কোন-

দিন বুঝতে পারেনি নিশীথ। কিন্তু মনে হয়, আজ যেন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় নিয়ম, যে ভালবাসায় ভুল ধরার কিছুই নেই, সেই ভালবাসার আত্মাকে একেবারে শূন্য করে দিতে ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগলো কার? নীরাজিতার মনের ভিতরেও কি বৈদ্যনাথ স্যারের পেনসিলের মত একটা তীক্ষ্মমুখ নিষ্ঠুর আক্রোশ লুকিয়ে ছিল?

কোথা থেকে কে যেন হঠাৎ এসে শীতল সরকারের কানের কাছে নিশীথের চরিত্রের গল্প বলে দিয়ে গিয়েছে। কে বলে গেল? এবং কোন গল্পটা? এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনের উপর দিয়ে কত গল্পই তো কতরকম কাণ্ড করে চলে গেল; কিন্তু সে সব গল্পের মধ্যে এমন কি ভয়ালতা আছে যার জন্য নীরাজিতার মত মেয়ের ভালবাসাও ভয়ে ভীরু হয়ে যেতে পারে?

কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারের সেই মস্তবড় সদাগরী অফিসের একটা আলোচনার গুঞ্জন এবং সেই সঙ্গে অফিসের মানুষগুলির মুখের সেই বাঁকা-বাঁকা হাসির ছবিটা মনে পড়ে। স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের রেয়ার-আর্থ ডিপার্টমেণ্টে তখন রিসার্চ অফিসার হয়ে কাজ করছিল নিশীথ। কাজটা নেবার একমাস পরেই কলকাতার হাসপাতালেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধ্যাবেলাটা ঘরের ভিতরে বসে থাকতে পারেনি নিশীথ। ঘরভরা মানুষের কান্নায় করুণ সেই ঘরের বেদনা সহ্য করতে না পেরে, আর বোধ হয় নিজেরও বদ্ধ নিশ্বাসের গুমোট সহ্য করতে না পেরে, একটা পার্কের নিরালা কোণে বেঞ্চির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা একা বসেছিল নিশীথ। পরের দিনও অফিসের একটা ছোট কামরার নিভৃতে আনমনার মত চুপ করে বসেছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবু হঠাৎ কামরার ভিতর ঢুকে নিশীথের সেই আনমনা মনটাকেই চমকে দিয়েছিলেন।

একগাল হাসি হেসে ঢলে পড়েন অনন্তবাবু—কলকাতার রাত

গুলো কি করে একটু ভালভাবে কাটানো যায় বলুন শুনি নিশাথবাবু?

ধীরাজবাবু মুখ টিপে হাসেন।—নিশাথবাবুকে অনর্থক এসব প্রশ্ন কেন অনন্তবাবু? একটা ভাল পার্কে বেশ একটু রাত পর্যন্ত যদি ওৎ পেতে বসে থাকতে পারেন, তবে বেশ ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাবেন, এবং রাতটা মন্দ কাটবে না।

—তাই নাকি নিশীথবাবু?—নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু।

হঠাৎ দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান, অনন্তবাবু এবং ধীরাজবাবু। তারপরেই নিশীথের সেই বিমূঢ় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর একবার হেসে কামরা ছেড়ে চলে যান।

সেদিন থেকে অফিসের নানা ঘরে নানা জনের মুখ-টেপা হাসির ফাঁকে ফাঁকে একটা চাপা আলোচনার গুঞ্জন রোজই জেগে উঠতো। সেই আলোচনার ভাষা কিছু কিছু নিশাথও নিজের কানে শুনেছে। ভাগ্য ভাল, চাকরিটা বেশিদিন ছিল না। ছ'মাস যেতেই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের অফিসের ঘরে সেই গুঞ্জনটা কি আজও বেঁচে আছে? এবং সেই গুঞ্জনই কি বাতাসে বাতাসে এতদূরে ভেসে এসে লাক্ষানগরের শীতল সরকারের কানের কাছে নিশাথ রায়ের চরিত্রের গল্প হয়ে বেজে উঠেছে?

কিন্তু ওটা যে একটা ঘোর মিথ্যা অপবাদের গল্প। অনন্তবাবু আর ধীরাজবাবুর মত ভয়ানক অন্ধ মানুষের একটা বিদ্‌ঘুটে কল্পনার গল্প। এই গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছেন আর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ে নীরাজিতা?

সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে ছায়া পড়েছে। পশ্চিম আকাশের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। চোখে পড়ে নিশাথের, ডালিয়ার বাগানের ভিতরে ছুটোপুটি করছে বেণু। বাড়িটার ফটকের থামে একটা

নাম লেখা আছে—শিবদাস দত্ত। নামটা বোধ হয় ঐ ভদ্রলোকেরই নাম, যিনি অলক্তকের ঘৃণা আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আসল রহস্যের কথাটা নিশীথকে এইমাত্র শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

নিশীথের জীবনের আরও গল্প আছে; এবং মনে করবার চেষ্টা করলে একে একে মনে পড়েও যায়! এবং এটাও সত্য যে, অনেক বছর আগের দেখা একটি মেয়ের নাম আজও হঠাৎ এক এক বার নিশীথ রায়ের ভাবনার মধ্যে বেজে ওঠে। শ্যামলীর নামটা ভুলে যায়নি নিশীথ।

শ্যামলীর বাবা গোপালবাবু ছিলেন নিশীথের বাবার অফিসের ক্যাশিয়ার। নিশীথের বাবা মারা যাবার পরেও গোপালবাবু মাঝে মাঝে নিশীথদের কলকাতার বাসায় আসতেন। নিশীথের একটা ভাল চাকরি হলো কিনা, শুধু এইটুকু জানবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন ইচ্ছা গোপালবাবুর ছিল না। অন্তত সেরকম অন্য কোন ইচ্ছার কথা তাঁকে কোনদিন বলতে শোনেনি নিশীথ। সেই গোপালবাবু খুবই আকস্মিকভাবে একদিন সকাল দশটার সময় অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং একঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। শুনেছিল নিশীথ, রোজ লক্ষ টাকা ঘেঁটে ঘেঁটে আর গুণে গুণে যাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরী-জীবন পার হয়েছে, সেই ক্যাশিয়ার গোপালবাবু নিজের জমার খাতায় দশটা টাকাও রেখে যেতে পারেননি।

শ্যামলীর দুর্ভাগ্যের আর একটা খবর জানতে পেরেছিল নিশীথ। শ্যামলীর বিয়ের একটা সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন গোপালবাবু; কথা ছিল, আসছে শ্রাবণেই বিয়েটা হয়ে যাবে। কিন্তু সে শ্রাবণ এলেও শ্যামলীর বিয়ে হলো না। হবেই বা কেমন করে? বিয়ের খরচ আসবে কোথা থেকে? কে দেবে? পাত্রপক্ষই চিঠি দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ বাতিল করে দিল।

আরও একটা সমস্যা। শ্যামলীদের দিন চলবে কি করে?

নিশীথ রায় নিজেই যেচে শ্যামলীর মার কাছে গিয়ে একটা কথা বলেছিল—বলুন, আপনাদের এই অবস্থায় আমি কি সাহায্য করতে পারি ?

শ্যামলীর মা বলেন—শ্যামলীর পড়াটা যেন নষ্ট না হয়; যাতে অন্তত এই চারটে মাস কলকাতায় থাকতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দাও, নিশীথ। শ্যামলীর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই দেশের বাড়িতে চলে যাব।

হ্যাঁ, সেই চারটে মাস শ্যামলীদের কলকাতায় থাকবার সব খরচ নিশীথই দিয়েছিল। এমন মস্ত কোন টাকা খরচের ব্যাপারও সেটা ছিল না। মাসে মাসে শ'দেড়েক টাকা, এবং শ্যামলীর পরীক্ষার ফী-এর জন্য একশো কুড়ি টাকা, এইমাত্র।

মাঝে মাঝে শ্যামলীদের বাড়িতে যেতে হতো। শ্যামলীর পড়ার সুবিধা বা অসুবিধার খোঁজ নিতে হতো। এবং, এমন একটা সন্ধ্যাও দেখা দিয়েছিল, যে সন্ধ্যায় শ্যামলীর চোখে জল দেখে শ্যামলীকে সান্ত্বনাও দিতে হয়েছিল। কারণ, শ্যামলীদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল নিশীথ, গোপালবাবুর একটা ফটোর দিকে তাকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শ্যামলী।

শ্যামলীরা দেশের বাড়িতে চলে যাবার পর বুঝতে পেরেছিল নিশীথ, বেশ চমৎকার একটা গল্প এরই মধ্যে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে একেবারে আলিপুর পর্যন্ত ছুটে চলে গিয়েছে। আলিপুরের ছোড়দি বললেন—শ্যামলী মেয়েটা তো দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, নিশি ?

চমকে ওঠে নিশীথ।—এ কথা আমাকে বলবার মানে কি ছোড়দি ?

ছোড়দি হাসেন—সত্যিই রাগ করলি নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাহ'লে শুধু আমার ওপর রাগ করছিস কেন ? তোদের পাড়াসুদ্ধ মানুষের ওপরও রাগ কর তাহ'লে ?

—তার মানে ?

—তার মানে সবাই যে জানে।

—কি জানে ?

—শ্যামলীর সঙ্গে তোর খুব ভাবসাব হয়েছে।

—তা হয়েছে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?

ছোড়দি আশ্চর্য হয়ে ভ্রূকুটি করেন—তাতে ভালমন্দ অনেক কিছু আসে যায়। লোকে আশ্চর্য হয়; লোকে অনেক কিছু সন্দেহ করে।

নিশীথ আশ্চর্য হয়—সন্দেহ ?

—হ্যাঁ। ভাবসাব হলো, অথচ বিয়ে হলো না, এটা তো ভাল কথা নয়।

—আমার সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হবে এরকম কোন কথা তো ছিল না।

—সেইজন্যেই তো ব্যাপারটাকে এত খারাপ দেখাচ্ছে। শ্যামলীকে বিয়ে করলেই ভাল করতিস।

—কি আশ্চর্য, বিয়ে করতে ইচ্ছে হলে তো বিয়ে করবো।

—ইচ্ছে করলেই তো হয়।

—না। মানুষের পক্ষে ইচ্ছে করে ইচ্ছে তৈরি করা সম্ভব নয়।

ছোড়দিও আর কোন তর্ক না করে নিশীথের হাতের কাছে এক পেয়ালা চা তুলে দিয়েছিলেন। আলিপুরের ছোড়দির বাড়ির সেই চা কোনমতে খেতে পেরেছিল নিশাথ। কিন্তু বীডন-স্ট্রীটের মাসিমার বাড়িতে এসে চা-এর কাপে একটা চুমুকও দিতে পারেনি। মাসিমা বড় বেশী গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার নামে এসব ভয়ানক কথা শুনতে আমাদের বড় কষ্ট হয়, নিশীথ।

—কি কথা ?

—গোপালবাবুর মেয়ে শ্যামলীর সঙ্গে…

চা না খেয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায় নিশীথ। এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবে, মানুষের জীবনের সব সত্য ও মিথ্যা কি এরকম এক-একটা ভুয়ো গল্পের সৃষ্টি ?

সেই ভুয়ো গল্পটা কি আজও মরে যায়নি ? একটা মেয়ের উপকার করতে চেষ্টা করেছিল নিশীথ, কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, সেই চেষ্টার গল্পটা একটা উপকারের গল্প না হয়ে নিশীথেরই চরিত্রের গল্প হয়ে গেল ! এতদিন পরে সেই ভুয়ো গল্পটাই কি উড়ে এসে অলক্তকের শীতলবাবু আর নীরাজিতাকে চমকে দিয়েছে ?

শিবদাস দত্তের বাঙলো-বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। জেঠামশাই কোথায় ? কাকিমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা কেন ? শিবদাসবাবুর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক বের হয়ে পড়লো নাকি ? নইলে এতক্ষণ ধরে চা খাওয়ার কথা তো ছিল না ? এবং চা খেতেই বা এত সময় লাগবে কেন ? দেখতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ, ডালিয়ার বাগানের পাশে ঘাসের উপর মাদুর পেতে ক্যারম খেলছে চঞ্চল আর দেবেশ।

এদিকে ওদিকে সব বাড়িরই জানালায় আলো ফুটে উঠেছে, এবং অনেক দূরের দলমা পাহাড় এইবার একেবারে আবছা হয়ে গিয়েছে। আর, একেবারে যেন নিরেট অন্ধকারটি হয়ে মুখ ঢেকে রয়েছে অলক্তক।

ঝাউ-এর কাতর শ্বাসানি থামলেও নিশীথের মনের উতলা নিঃশ্বাসের অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি। জানতে ইচ্ছে করে, কোন গল্পটা শুনতে পেয়ে শিউরে উঠলো নীরাজিতা ?

একটা ফটোর গল্প মনে পড়ে। সেটাও চাকরি-জীবনের একটা ঘটনার গল্প। স্মিথ অ্যাণ্ড জনসনের অফিসের চাকরি নয়, কলকাতার বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরিতোষবাবুর মিনারেল সাপ্লাই কোম্পানির একটা চাকরি। নিশীথের কাজে বড় খুশি

হয়েছিলেন পরিতোষবাবু। কিন্তু অফিসের ম্যানেজার কৈলাসবাবু মাঝে মাঝে ঠোঁটে দাঁত চেপে অদ্ভুতভাবে হাসতেন, এবং নিশীথের কাছে এসে হেঁয়ালির মত একটা কথা প্রায়ই ফিসফিস করে বলতেন—শুধুই কি আপনার কাজ দেখে মালিক খুশি হয়েছেন মশাই? আপনি কি তাই মনে করেন?

নিশীথ বলে—তাই তো মনে করি।

ঠোঁটে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেন কৈলাসবাবু—খুব ভুল করছেন, নিশীথবাবু। এই অফিসের কেউ অন্তত আপনার চেয়ে কম এফিশিয়েণ্ট নয়।

পরিতোষবাবুর গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার কাজ ছেড়ে দেবার পর কলকাতার অফিসে একটা আশার সাড়া জেগে উঠলো যেদিন, সেদিন নিশীথ রায়ের দিকে অনেকগুলি চোখ বার বার অপ্রসন্ন হয়ে তাকিয়েছিল। কোন সন্দেহ নেই, এইবার গিরিডি-অফিসের ম্যানেজার হবে পরিতোষবাবুর আদুরে অফিসার এই নিশীথ রায়। আটশো টাকা মাইনে, তার উপর অমন সুন্দর একটি সৌখীন কোয়ার্টার!

তার পরের দিনেই পরিতোষবাবু একটি বেনামী চিঠি পেলেন, অনেক মিনতি করে অনেক কথা লিখেছে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, নিশীথ রায়ের মত সাংঘাতিক খারাপ চরিত্রের মানুষকে আর বেশ প্রশ্রয় দেবেন না। ওর টেবিলের দেরাজটা একটু সার্চ করলেই সব জানতে পারবেন।

নিশীথের টেবিলের দেরাজ সার্চ করেছিলেন পরিতোষবাবু, এবং একটা ফটো পেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে একগাদা প্রেমপত্র, নিশীথের কাছে লেখা; এবং সেই প্রেমপত্রের বক্তব্যও একগাদা বীভৎসতা।

—এসব কি বস্তু, নিশীথ?—নিশীথকে কাছে ডেকে নিয়ে অদ্ভুত একটা গম্ভীর হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিলেন পরিতোষবাবু।

প্রথমে শুধু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল নিশীথ, তারপর চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠেছিল।

পরিতোষবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—আমার কিন্তু বিশ্বাস করতে একটুও ভাল লাগছে না নিশীথ।

নিশীথ বলে—সেটা আপনি বুঝে দেখুন। মোট কথা, আমি বিদায় নিলাম।

—সে কি! আমি তো তোমাকে মোটেই সন্দেহ করছি না।

—আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার চাকরিতে থাকা সম্ভব হবে না।

—তাহ'লে আমার গিরিডি অফিসের ম্যানেজার হবে কে?

—কৈলাসবাবু।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল নিশীথ, কিন্তু গল্পটা নিশীথকে ছেড়ে দেয়নি। পরিতোষবাবুর অতবড় অফিসের ঘরে যে গল্পটা সেদিন ফিসফিস করে উঠেছিল, সেই গল্পটাকে চার বছর পরেও একদিন শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। বেলঘরিয়ার ডাক্তার রাজকিশোরবাবু, যিনি নিশীথের বড় ভগ্নীপতির বড়দা, তিনি পথে দেখা হতেই দুঃখ করলেন—সবটা শুনেছি নিশীথ, শুনে বড় দুঃখ পেয়েছি। চাকরি যাক, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এরকম একটা বিশ্রী কারণে, অর্থাৎ চরিত্রের জন্য চাকরি যাবে কেন?

সেই ফটোর গল্পটাকেই কি শুনতে পেয়েছে অলক্তক? কিন্তু ওটা কি সত্যিই মানুষের চরিত্রের গল্প হলো? কৈলাসবাবুর চক্রান্তের সৃষ্টি ঐ গল্পটাকে একটুও সন্দেহ না করে রাজকিশোরবাবুর মত অলক্তকের শীতলবাবুও তাহ'লে বিশ্বাস করেছেন? এবং নীরাজিতাও।

জেঠামশাই আর কাকিমা যে ঐ ডালিয়ার বাগানের আড়ালে ডুব দিয়েই রইলেন! কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। ওঁরা দুজনে তাহ'লে ঘরের ভিতর বসে গল্প করছেন। বেণুটাই বা কোথায়

গেল? ক্যারমের খটাস-খটাস আর শোনা যায় না। দেবেশ আর চঞ্চলও বোধহয় ঘরের ভিতরে গিয়ে বসেছে।

কিন্তু সন্ধ্যাও যে পার হতে চললো। সবাই বোধহয় শিবদাস দত্তের আরও বড় অনুরোধের পাল্লায় পড়েছে। শুধু চা নয়, বোধহয় একেবারে রাতের খাওয়া না খাইয়ে ছেড়ে দেবেন না পরম অতিথিবৎসল ঐ শিবদাস দত্ত।

জীবনের ত্রিশ বছর বয়সের সব অনুভবের ইতিহাস যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করছে নিশীথ—সত্যিই এমন কোন ছায়া, কোন শিহর, আর কোন দাগ আজও সে ইতিহাসের স্মৃতি-বিস্মৃতির ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে কি, যার জন্য নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকেই ভয় করতে হবে? যদি থেকে থাকে, তবে এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাক না কেন? তাহ'লে নিশীথ রায়ের মনও সব ক্ষোভের জ্বালা থেকে এই মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যাবে, নীরাজিতার ঘৃণাকে মনে মনে বরং অভিনন্দিত করে কালিকাপুরে ফিরে যেতে পারবে নিশীথ।

সন্ধ্যার আলোতে ঝাউ-এর ছায়া কখনও দোলে, এবং কখনো বা সিরসির করে কাঁপে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে যেন নীল জলের প্রকাণ্ড একটা ঢেউ নিশীথের চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাদা ফেনার ফোয়ারা ছড়াতে থাকে। ঝাউ-এর শব্দ সমুদ্রের কল্লোলের মত মনে হয়।

না, নিতান্ত মিথ্যে নয়। একেবারে মিথ্যে একটা প্রহেলিকার শব্দ নয়। সত্যিই একদিন পুরীর সমুদ্রতটের বালুবেলায় বেড়াতে বেড়াতে নিজেরই বুকের ভিতর একটা ইচ্ছার কল্লোল শুনতে পেয়েছিল নিশীথ। নাটোরের কেশববাবু সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে এসেছিলেন। কেশববাবুর চেহারাটা এখনও বড় স্পষ্ট মনে পড়ে, ফরসা পাতলা ও লম্বা মানুষটি। জরির কাজ-করা একটা লক্ষ্ণৌ-টুপি ছিল তাঁর মাথায়, এক হাতে মোষের শিং-এর স্টিক, আর এক হাতে পাইপ, সেই কেশববাবু প্রায় এক

ঘণ্টা ধরে নিশীথের সঙ্গে তাঁর মাছ-ধরার নানা মজার গল্প বলেছিলেন।

সেদিন, পুরীর সমুদ্রের সেই বালুবেলার উপর বিকালের আলোতে কেশববাবুর সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হলো, তখন আর একজন সেখানে ছিল, এবং তার হাতে একটা সেতারও ছিল। কেশব বাবুর মেয়ে অনুরাধা। কেশববাবুর মাছ ধরার গল্প শুনে অনুরাধাও বার বার হেসে উঠেছিল, এবং নিশীথ রায়ের চোখ বেশ একটু বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, অনুরাধার মুখের হাসিটা অনুরাধার সেই ছিপছিপে সুন্দর চেহারার সঙ্গে কী সুন্দর মানিয়েছে!

কেশববাবু বললেন—তোমার পরিচয় জানতে পেরে বড় খুশি হলাম। তোমার বাবা নীরেন আর আমি একদিন সাংঘাতিক বর্ষার মধ্যে জেলেডিঙি নিয়ে একেবারে মাঝ পদ্মা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। মাছ ধরতে পারিনি, কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। একটু থেমে নিয়ে খুশির স্বরে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন কেশববাবু—আঃ, ছেলেবেলার সে সব দিন, কি দিনই না গিয়েছে

প্রশ্ন করেছিল নিশীথ—পুরীতে আর কতদিন থাকবেন?

—পুরীতে আর মাত্র এক সপ্তাহ।

—তারপর কলকাতায় ফিরবেন?

—না, এই গ্রীষ্মটা শেষ না হবার আগে কলকাতায় ফিরবো না। ভাবছি, ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে আর একটা মাস সমুদ্রের হাওয়া খাব।

সেই একটা সপ্তাহ, রোজই বিকালে কেশববাবুর সঙ্গে দেখা হতো। তার মানে অনুরাধার সঙ্গেও দেখা হতো। বিকেল ফুরিয়ে যখন সন্ধ্যা নামতো, যখন ঢেউ-এর নীলটুকু আর দেখা যেত না, শুধু সাদা ফেনার হাসিটুকু আধো-অন্ধকারের বুকে নেচে নেচে আছাড় খেত, তখন কেশববাবুই অনুরোধ করতেন—যদি কোন

কাজের তাড়া না থাকে, তবে আর একটু সময় এখানে থেকে যাও, নিশীথ। অনুরাধার সেতার শুনে যাও।

কেশববাবুর শখ, সন্ধ্যা হলে পুরীর সমুদ্রের সেই বালুবেলায় কোন একটি নিভৃতে বসে মেয়ের হাতের সেতার বাজনা শোনেন। নিশীথও শুনেছিল। আজও মনে পড়ে, অনুরাধার সেতারের ঝংকার আর সমুদ্রের কল্লোল একসঙ্গে মিশে কী অদ্ভুত এক শব্দের উৎসব জাগিয়ে তুলতো!

অনুরাধার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি বললেই হয়। সাত দিনের মধ্যে মোট সাতটা কথাও হয়নি। কিন্তু অনেক কথা মনে হয়েছিল নিশীথের, তার মধ্যে বিশেষ একটা কথা নীরব কল্লোলের মত নিশীথের বুকের ভিতরেই বেজেছিল। একটা ইচ্ছার কথা। অনুরাধাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ইচ্ছা করে, ব্যস্, ঐ পর্যন্ত; তার পর তো পুরী ছেড়ে চলেই গেলেন কেশববাবু আর অনুরাধা, এবং অনুরাধার সেতারও। সত্যি কথা, অনুরাধা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল নিশীথের, পুরীর সমুদ্রের কল্লোল যেন মধুরতা হারিয়েছে।

নিশীথের ছুটি ফুরোতে আরও কিছুদিন বাকী ছিল, এবং ইচ্ছে করলেই ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে অনুরাধার সেতার আবার শোনবার সুযোগও ছিল। কিন্তু ওয়াল্টেয়ারে যায়নি, যেতে পারেনি নিশীথ। এমন কি, কেশববাবুর কলকাতার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকা সত্ত্বেও কোনদিন কেশববাবুর বাড়িতে আসেনি নিশীথ। সেই বর্ষাতে না, এবং এই তিন বছরের মধ্যে কোন একটি দিনেও না। এবং আজ কল্পনাও করতে পারে না নিশীথ, এখন কোথায় কোন সমুদ্রের বালুবেলার উপর বসে সেতার বাজাচ্ছে কেশববাবুর মেয়ে অনুরাধা।

তিন বছর আগের জীবনের এই গল্পটাই কি আজ নীরাজিতার কানে কানে কেউ বলে দিয়ে গিয়েছে? কে বলবে? নিশীথ রায়ের সেই ইচ্ছার তো ভাষা ছিল না, তবে সেটা মানুষের কানে

পৌঁছবে কি করে? ভালবেসে ফেলা আর ভালবাসতে ইচ্ছা করা, এই দু-এর মধ্যে কি কোন তফাত নেই? সেই তফাতটুকু বুঝতে পারবে না নীরাজিতা, তাই-বা কি করে সম্ভব হয়?

কে জানে কি ভেবে আর কি শুনে ভয় পেয়েছে নীরাজিতা! কিন্তু নিশীথ রায়ের মন কি বলে? অনুরাধার সেতার শুনে ওরকম একটা ইচ্ছা না হওয়াই কি উচিত ছিল? নিশীথ রায়ের চরিত্রের গায়ে একটা ক্ষতের দাগ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে তিনবছর আগের ঐ একটা ইচ্ছা? আশ্চর্য! এই যে পৃথিবীর বুকের ভিতরে আর বাইরে নির্জীব শক্ত পাথরের স্তর আর স্তূপ পড়ে রয়েছে, তাদেরও গায়ে ক্ষতের চিহ্ন আছে। নানারকম ইচ্ছার ক্ষত, এবং সে ইচ্ছার উপর কারও কোন হাত ছিল না। মানুষের পাঁজর নিশ্চয় আর্কিয়ান গ্র্যানিটের চেয়ে বেশী নির্জীব আর বেশী কঠিন কোন বস্তু নয়।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় নিশীথ! শিবদাস দত্তের চা-এর জল কি এই এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেও ফুটে উঠতে পারলো না? তবে এত দেরি হচ্ছে কেন? এখনই রওনা হলে কালিকাপুর ফিরতে কত রাত হয়ে যাবে, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না জেঠামশাই?

চক্রবর্তী মশাই অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন। রাজ-পোখরাতেই তাঁর এক কুটুমের বাড়ি আছে, সেখানেই তিনি আজ থেকে যাবেন। দেখতে পায় নিশীথ, কন্‌ট্রাক্টর জানকীবাবুর যে গাড়িটা আজ এখানে বরযাত্রী বয়ে আনবার দুর্ভাগ্য সহ্য করেছে, সেই গাড়ির ড্রাইভার মুনিরামও কোথায় যেন গিয়েছে। মুনিরামও কি শিবদাস দত্তের চা খেতে গিয়ে আটকে পড়লো? কালিকাপুরে ফিরে যাবার উৎসাহটাই শিথিল হয়ে গেল, কিংবা রাজপোখরার এই লাক্ষানগরের উপর রাগ করতেই ওরা ভুলে গেল?

কে যেন গাড়ির কেরিয়ারের ঝাঁপ খুলছে, শব্দ শুনেই চমকে ওঠে নিশীথ।—কে?

—আমি মুনিরাম।

—কি করছো তুমি ?

—কাকিমা ফুলের ঝুড়িটা চাইছেন।

স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপের ঝুড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল মুনিরাম। কাণ্ড দেখে মনে মনে হেসে ফেলে নিশীথ। —বাঃ, তবে কি শিবদাস দত্তের বাড়িতে এই স্থলপদ্ম আর হলদে গোলাপ উপহার দিয়ে, তার বদলে একঝুড়ি ডালিয়া উপহার নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কাকিমা ? পুরনো কুটুমবাড়িতে এসেও এতটা প্রীতির মাখামাখি কেউ করে না। শিবদাস দত্ত তো মাত্র দেড়ঘণ্টার চেনা এক ভদ্রলোক !

ইচ্ছে না থাকলেও বার বার অলক্তকের দিকে নিশীথের চোখের দৃষ্টিটা সেইরকমই রক্তাক্ত বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ছুটে যায়। ছায়া, আবছায়া আর অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীতল সরকারের বাড়িটা, নিশীথ রায়ের চরিত্রের একটা গল্প শুনে যেন একটা আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন নিরেট হয়ে গিয়েছে।

এত ভয় কেন ? যদি কোনদিন, কিংবা আজও এখনি হঠাৎ এসে নীরাজিতা প্রশ্ন করে, তবে অনায়াসে একটা স্বপ্নের গল্প হেসে-হেসে বলে দিতে পারবে নিশীথ। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন, ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নকে একটুও খারাপ লাগেনি, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে পড়তেই লজ্জা পেয়েছিল নিশীথ। এক নারীর মূর্তি, এবং সত্যিই পৃথিবীতে ওরকম কোন নারী আছে কিনা, জানে না নিশীথ। মুখে কথা নেই, চোখে হাসি নেই, একবিন্দু সাজ বা লাজের শোভা নেই, শুধু একটা নারী-শরীর। নিশীথের একেবারে চোখের কাছে এসে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, ঢিপ ঢিপ করে নিশীথের হৃদপিণ্ডটা। সরে যায় না সেই মূর্তি, এবং নিশীথও বলতে পারেনা যে, সরে যাও। সে মূর্তির চোখদুটো শুধু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে নিশীথের চোখদুটোকেও অলস করে ফেলতে থাকে। সেই

অদ্ভুত মূর্তির দুই ঠোঁটের কাঁপুনিগুলিকে এক চুমুকে পান করে পাগল হয়ে যাবার জন্য নিশাথ রায়ের নিঃশ্বাসের বাতাস তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়।

বড় বিশ্রী ও নির্লজ্জ একটা স্বপ্ন। কিন্তু নিতান্তই স্বপ্ন, একেবারে বস্তুহীন একটা অসারতা। এরকম একটা স্বপ্নের দায়ে নিশীথ রায়ের চরিত্রটাকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে হবে, এমন কোন নিয়ম কি আছে?

মাদল বাঁশি বাজিয়ে এবং বড় বড় জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সাঁওতাল-দের একটা উৎসবের মিছিল চলে গেল। তার পরেই বিদ্যুতের একটা ঝিলিক; অলক্তকের চেহারাটাও যেন ঝিক করে একটা ঠাট্টার হাসি হেসে আবার অন্ধকারের ভিতরে মুখ লুকিয়ে নিল।

আতঙ্কিতের মত চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায় নিশীথ। বুঝতে পারা যায়, আকাশের পুব আর দক্ষিণ জুড়ে ঘন মেঘের ভার থমথম করছে। বাতাসও খুব ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ঝড় উঠবে বোধ হয়। বৃষ্টি হবে নিশ্চয়। আরও দেরি করিয়ে দিয়ে, এবং আরও দুর্ভোগে নাকাল করে আর জলকাদা মাখিয়ে দুর্দশার চরম করে দিয়ে তবে মুক্তি দেবে রাজপোখরার এই বিদ্রূপে বিষাক্ত রাত্রিটা। বিরক্ত হয়ে, এবং কাকিমা ও জেঠামশাই-এর কাণ্ডজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে বার বার গাড়ির হর্ন বাজাতে থাকে নিশীথ।

এ কি! হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে নিশীথ। অলক্তকের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করছে কেন? নিশীথ রায়ের এতক্ষণের এত প্রশ্নের সব অহংকার যেন হঠাৎ একটা আতঙ্কের ঝিলিক খেয়ে চমকে উঠেছে।

কি আশ্চর্য, এতগুলি গল্প এত সহজে মনে পড়ে গেল, কিন্তু সবশেষে মনে পড়লো সেই গল্পটা, যেটা কোন অপবাদ আর চক্রান্তের গল্প নয়; শুধু একটা ইচ্ছার গল্প নয়, উপকারের গল্প নয়, অসার স্বপ্নের গল্পও নয়। সেটা যে একেবারে একটা বাস্তব সত্য,

একটা ঘটনা, নিশীথ রায়ের ত্রিশবছর বয়সেরই একটা নিদারুণ ভীরুতা। গালুডির ধীরেনবাবুর স্ত্রী সুনয়নাকে ভয় করে নিশীথ রায়ের মত মানুষ, এই গল্পটা যে সত্যিই নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প। এই গল্প কেউ না জানুক, নিশীথ রায় নিজে তো জানে। কালিকাপুরের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কেন? বার বার তিনবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালিকাপুর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য কেন ব্যাকুল হতে হয়েছিল? কেন বাঙলোর ফটকের উপর 'আউট' টেনে দিয়ে ভিতরের ঘরের মধ্য চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়? কালিকাপুরের কাঁচা সড়কের উপর মোটর-গাড়ির শব্দ শুনলেই কেন চমকে উঠতে হয়? চিঠির উপর গালুডির ডাকঘরের ছাপ দেখলেই সে চিঠি খুলতে নিশীথ রায়ের হাত কেন কেঁপে ওঠে?

সে নারীর নাম সুনয়না, বয়সের তুলনায় শরীরটা যেমন বেশী ভারি, মুখটা তেমনই বেশী কাঁচা। কেউ না জানুক, এবং সুনয়নার সেই শান্ত ও গম্ভীর চেহারা দেখে পৃথিবীর কারও চোখে একবিন্দু সন্দেহ নাই বা দেখা দিক, নিশীথ জানে, কী ভয়ানক আবেদন ঐ সুনয়না! কী প্রচণ্ড শাসন ঐ সুনয়না! কী অদ্ভুত মোহ ঐ সুনয়না! সুনয়নার দুঃসাহস দেখে শিউরে উঠতে হয়, ভয় পায়, সরে যাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে ওঠে; কিন্তু সরে যেতে পারেনি নিশীথ। ভুলে যায়নি নিশীথ রায়, বরং ভাবতে গিয়ে বার বার নিজেরই ভীরুতাকে ঘৃণা করে ধিক্কার দিয়েছে। একবার নয়, অনেকবার এই ভীরুতার অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছে।

তবে আর অলক্তকের উপর কিসের অভিমান? অলক্তকের ঘৃণা ভয় আর সন্দেহের উপর এত রাগ করবার কি আছে? সুনয়নার গল্পটা যদি শুনে থাকে নীরাজিতা, তবে কি নীরাজিতার ভয় পাওয়া উচিত নয়? বুকে হাত দিয়ে জোর করে বলবার সাহস আছে কি নিশীথ রায়ের, সুনয়নার লেখা চিঠির কথাগুলি নিশীথ রায়ের চরিত্রেরই গল্প নয়? নিজেকে হীরার টুকরো বলে মনে করলেই

বা কি? হীরা হলেও দাগী হীরা। অলক্তকের বন্ধ ফটকের ঐ প্রকাণ্ড তালাটার দিকে রাগ করে তাকাবার কোন অধিকার নিশীথ রায়ের নেই, গল্পটা নীরাজিতা সরকার জানতে পারুক বা না পারুক।

জিওলজির মানুষ, শক্ত পাথর ঘাঁটাঘাঁটি করে সারা দিনের বারোটি ঘণ্টা পার হয়ে যায়, সেই নিশীথ রায়ের মুখটা অভিমানী ছেলেমানুষের মুখের মত কোমল হয়ে যায়, এবং চোখদুটোও যেন ছলছল করে। একটা কথা শুধু জানতে পারলো না নীরাজিতা। সুনয়না নামে সেই ভয়ের শাসন থেকে বাঁচতে পারা যাবে, নীরাজিতার ভালবাসার মধ্যে এই সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছিল নিশীথ রায়। তাইতো অনেক লোভে লোভী হয়ে এই রাত্রেরই একটি লগ্নের উৎসবে নীরাজিতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত হবার আশায় ছুটে এসেছিল নিশীথ রায়।

না, আর রাগ করে নয়, বেশ খুশী মনেই রাজপোখরার এই ঝাউ-এর ছায়া থেকে এইবার অনায়াসে ছুটে চলে যেতে পারবে নিশীথ রায়। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়িটা ছেড়ে দিলে কালিকাপুর পৌঁছে যেতে খুব বেশী রাত হয়ে যাবে না।

কিন্তু ও কি! কার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বেণুটা?

বেণুর চোখদুটো যেন নতুন উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে। কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে বেণু—প্রতিভাদি তোমাকে ডাকতে এসেছেন, দাদা। শিগগির চা খাবে চল।

বেণুর প্রতিভাদি? তার মানে ঐ ডালিয়া বাগানের মালিক শিবদাস দত্তের মেয়ে? তাই কি?

নিশীথ রায়ের মনের নীরব প্রশ্নের উত্তর প্রতিভার মুখের কথায় আপনি বেজে ওঠে।—আপনার চা আর খাবার এখানেই দিয়ে যাবার জন্য বাবা বললেন। আমিই বললাম, বাঃ, তা কেন হবে?

—কি বললেন?

—চা খাবেন চলুন।

কোন কুণ্ঠা নেই, কথার মধ্যে কোন সূক্ষ্ম সৌজন্যের সতর্কতা নেই, সোজা সরল ও সুস্পষ্ট ভাষার একটা আহ্বান, চা খাবেন চলুন। আকাশে মেঘ, বাতাস বড় ঠাণ্ডা, ঝাউ-এর ছায়া সিরসির করে দোলে, ফটকের আলোটাও যেন ঝাঁজ হারিয়ে ঢলঢল করে; এবং শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার মুখের হাসি যেন রাজপোখরার রাত্রিটাকে হঠাৎ আরও স্নিগ্ধ করে দিয়েছে। গাড়ির ভিতরে বসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।

কিসের বিস্ময়? প্রতিভাকেই একটা বিস্ময় বলে মনে হয়, কারণ প্রতিভাও কি জানেনা যে, কিসের জন্য নিশীথ রায়ের মনুষ্যত্বটাকেই সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে অলক্তকের শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ে নীরাজিতা সরকার?

প্রতিভা দত্তের সাজের মধ্যেও বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। একটা চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে প্রতিভা; প্রতিভার মত বয়সের কোন আধুনিকা এরকম একটা লাল-পেড়ে শাড়ি পরেছে এরকম দৃশ্য কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারেনা নিশীথ। প্রতিভার চোখের চশমাটা সোনার ফ্রেমের বটে, কিন্তু নিতান্তই সাদাসিধা ফ্রেম। এলোমেলো খোঁপাটা একটা সিল্কের রুমাল দিয়ে বাঁধা। পায়ে জুতো নেই। নিশীথ রায়ের চোখ-দুটো স্বীকার করে, ওরকম পা জুতো দিয়ে না ঢেকে রাখাই ভাল। সত্যিই, পীচ-মাখানো কালো পথের উপর প্রতিভা দত্তের পা-দুটো যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে, দুটি লালচে কোমলতার স্তবক।

নিশথ বলে—আপনি মিছিমিছি কষ্ট করলেন। আমার চা খাবার ইচ্ছেই নেই।

—ইচ্ছে নেই কেন?

শিবদাস দত্তের মেয়ের মুখে সত্যিই-যে কোন সঙ্কোচের বালাই

নেই। সোজা সরল প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে হয়, উত্তরের ভাষাটাকেও তাড়াতাড়ি তৈরি করতে পারেনা নিশীথ রায়, এবং আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে কুণ্ঠিতভাবে বলে—আপনি আমাকে এ-ধরণের কোন প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হব।

প্রতিভা বলে—কিন্তু আপনি চা না খেলে কি আমরা খুশি হব?

নিশীথ হেসে ফেলে—খুশি না হোন, দুঃখিত হবারও কোন কারণ নেই।

—আপনি খুবই ভুল কথা বললেন। আপনি আমাদের সামান্য একটা অনুরোধ তুচ্ছ করবেন, অথচ আমরা দুঃখিত হব না, এটা কেমন করে হয়?

অপ্রস্তুতের মত প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়, এবং কল্পনাও করতে পারে না বোধহয়, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সেই ঝকঝকে সপ্রতিভ মূর্তির সামনে নিশীথের চেহারাটাকে কী ভয়ানক বোকা-বোকা উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে।

নিশীথ বলে—আপনিও আমাকে অনুরোধ করতে এসেছেন, ভাবতে একটু আশ্চর্যই লাগছে।

—আশ্চর্য বোধ করছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আপনি কি জানেন না, কেন অলক্তকের ফটক বন্ধ?

—জানি বৈকি।

—জানেন না বোধহয়, নইলে আমাকে চা খাইয়ে খুশি হবার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন না।

প্রতিভার চশমার সোনার ফ্রেম যেন ঝিক করে জ্বলে ওঠে—বুঝলাম না, কি বলতে চাইছেন আপনি।

—এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বললে…

—বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।

—আপনি জানেন না নিশ্চয়, ওরা আমার চরিত্রের খবর শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু আমার ভয় কিসের?

—ভয় না করুন, একটু ঘেন্নাও তো করতে হয়।

—একটুও না।

—কি বললেন?

—আমি কাউকে ঘেন্না করতে পারি না।

—কেন?

—সে অহংকারই আমার নেই।

রাজপোখরার আকাশের পুবে আর একটা লিকলিকে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিশীথ রায়ের মুখে একটা অদ্ভুত প্রশ্নও যেন ভয়ানক কৌতূহলের জ্বালায় ছটফট করে ওঠে—কিসের অহংকার নেই।

—চরিত্রের অহংকার।

চরিত্রের অহংকার নেই, এরকম একটা কথাকে এত অহংকারের সুরে উচ্চারণ করতে পারে কোন মেয়ে, কল্পনা করতে পারেনি নিশীথ। লাক্ষানগর রাজপোখরার পথের উপর ঝাউ-এর ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে শিবদাস দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ের মুখে এরকম একটা কথা নিজের কানে শুনতে না পেলে বিশ্বাসও করতে পারা যেত না। কিন্তু কত স্পষ্ট করে, আর একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে কথাটা বলে দিয়েছে প্রতিভা।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচে আকাশের বিদ্যুতের ঝিলিক বার বার চমক জাগিয়ে খেলা করছে। মনে হয় নিশীথের, প্রতিভা দত্তেরও জীবনের একটা অহংকার যেন বার বার ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠছে। প্রতিভার মুখটাকেও বড় বেশি অহংকারে গড়া একটা মুখ বলে মনে হয়। পৃথিবীর কোন ভ্রূকুটির, কোন অপবাদের, কোন অভিযোগের ভয় করে না। চরিত্রের অহংকার নেই,

এটাই যেন প্রতিভা দত্তের চরিত্রের সবচেয়ে বড় অহংকার।

ভুলে গিয়েছে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভা শুধু সৌজন্যের খাতিরে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু চা খাওয়ার একটি সাগ্রহ অনুরোধ জানাতে; এবং নিশীথের পক্ষেও সৌজন্য রক্ষা করতে হলে এখন শুধু একটা ভদ্রতার হাসি হেসে প্রতিভার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হয়, ডালিয়ার বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঐ বাঙলোবাড়ির একটি চা-এর আসরের দিকে।

কিন্তু নিশীথ রায়ের চোখদুটো বোধহয় নিবিড় এক কৌতূহলের আবেশে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গিয়েছে। রাজপোখরার পথের উপর সুন্দর একটা রহস্য নিশীথের চোখের কাছাকাছি এসে মনের ভিতর একটা নীরব বাচালতার ঝড় জাগিয়ে দিয়েছে। অনেক কথা বুকের ভিতর ঠেলাঠেলি করছে। কিন্তু কথাগুলিকে বুকের ভিতরেই চেপে রাখতে হয়। বলা যায় না। বললেই মাত্রাছাড়া অভদ্রতা হয়ে যাবে; এবং সে-সব কথার একটি কথাও স্পষ্ট করে বলবার কোন অধিকার নিশীথ রায়ের নেই।

সত্যিই কি ঐ কথাটা প্রতিভা দত্তের জীবনের একটা অহংকারের প্রতিধ্বনি? প্রশ্ন করতে পারে না, কিন্তু নিশীথ রায় তার অপলক চোখ নিয়ে প্রতিভা দত্তেরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; যেন আশা করছে নিশীথ, প্রতিভা দত্তের মুখটাই আর একটু মিষ্টি এবং আর একটু নরম হয়ে নিশীথ রায়ের প্রশ্নের আকুলতা শান্ত করে দেবে।

চমকে না উঠলেও একটু আশ্চর্য হয় নিশীথ। সত্যিই প্রতিভা দত্তের মুখে যেন একটা আক্ষেপের বেদনা করুণ হয়ে উঠেছে। মাথাটাকে একটু হেঁট করেছে প্রতিভা, এবং মুখের হাসিটাকেও যেন দু'ঠোঁটের ফাঁকে গুটিয়ে নিয়েছে। মনে হয়, কি যেন ভাবছে প্রতিভা, এবং সেই ভাবনার ছোঁয়া সহ্য করতে না পেরে প্রতিভার সব

অহংকারের ছায়া পালিয়ে গিয়েছে। অহংকারে গড়া মুখ নয়, বেশ একটু বেদনার্ত মুখ।

রাজপোখরার আকাশের চেহারা বদলায় না। থমথমে মেঘের আড়ালে সব তারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আর বিদ্যুতের চমকও থামছে না। কিন্তু হয় নিশীথ রায়ের চোখের আশা, নয় প্রতিভা দত্তের মুখের ছবি এক-একটা চমক লেগে বদলে যাচ্ছে। শুধু দেখতে থাকে নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের চোখের উপর ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে উঠেই মিলিয়ে গেল, আর আনমনা হাসির মত ছোট একটা হাসিকেও লুকিয়ে ফেললো প্রতিভা। যেন কাউকে ঠাট্টা করছে প্রতিভা, এবং সেই ঠাট্টার আড়ালে যেন একটা উত্তপ্ত ধিক্কারও আছে। নইলে চশমার কাচের আড়ালে প্রতিভা দত্তের চোখদুটো হঠাৎ ধিক করে জ্বলে উঠবেই বা কেন?

বড় শান্ত দেখাচ্ছে প্রতিভাকে; বেশ শক্ত রকমের শান্ত। ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে কি যেন ভাবলো প্রতিভা, এবং তার পরেই আরও শক্ত হয়ে গেল প্রতিভার মুখের রূপ। মনে হয়, খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে প্রতিভা। খুব জোরে চলতে চলতে হঠাৎ পায়ের কাছে একটা গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে মানুষের চোখ যে-রকম চমকে উঠে সাবধান হয়ে যায়, সেই রকম চোখ করে নিজেরই আঙুলের একটা আংটির দিকে তাকিয়ে আছে প্রতিভা।

বোধ হয় ভয় পেয়েছে প্রতিভা, নইলে বেণুর ছোট্ট হাতটাকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে কেন?

—চল, প্রতিভাদি। ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠেছে বেণু।

প্রতিভা বলে—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

নিশীথ বলে—বেণুকে যেতে দিন।

কোন উত্তর না দিয়ে, এবং অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেণুর হাতটাকে তেমনই শক্ত করে ধরে প্রতিভা বলে—আপনিও চলুন।

—যাচ্ছি, কিন্তু বেণুকে ছেড়ে দিন।

বেণু বলে—হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও, প্রতিভাদি। আমি যাই, নইলে চঞ্চলদা আমার ডালিয়া চুরি করে ফেলবে।

বেণুকে ছেড়ে দিলে নিশীথের চোখের সামনে একলা হয়ে যেতে হবে, এই ভয় ছাড়া আর কি ভয় করতে পারে প্রতিভা? একলা হতে চায় না, ইচ্ছে নেই, এবং নিশীথ রায়ের চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাষার রকম-সকমও বোধহয় প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মনের ভিতরে একটা সন্দেহের উৎপাত ঘটিয়ে দিয়েছে।

বুঝতে পারে নিশীথ, শিবদাস দত্তের মেয়ে নিশীথ রায়ের কাছে সৌজন্যের অতিরিক্ত আর কিছু বলতে চায় না, জানতেও চায় না।

—আমার একটা অনুরোধ শুনুন! নিশীথ রায়ের গলার স্বরে যেন একটা অসহায় আবেদন, একটা সান্ত্বনালোলুপ পিপাসা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিভা দত্তের সপ্রতিভ মূর্তিও চমকে ওঠে। চোখ তুলে নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে, ভীরু বিস্ময়ে বিব্রত হয়ে প্রতিভা দত্ত বিড়বিড় করে—কি বললেন?

—বেণুকে চলে যেতে দিন। আমি তো যাচ্ছিই।

প্রতিভা দত্তের হাতটা একবার কেঁপে উঠেই শিথিল হয়ে যায়, এবং বেণুও ছাড়া পেয়ে যেন নূতন উল্লাসের নাচের মত ফুরফুর করে দৌড়ে চলে যায়।

নিশীথ হাসে—আপনি বোকা নন; বেণুকে ছেড়ে দিতে কেন বললাম, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।

—কিন্তু ভুল করলেন।

—কেন?

—আপনি যদি আমাকে একলা পেয়ে কোন নতুন কথা বলেন কিংবা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি কোন উত্তর দেব না।

—কি বলবো আমি? কি সন্দেহ করছেন আপনি?

—আপনি নীরাজিতার উপর রাগ করে এখুনি একটা হিরোয়িক কাণ্ড যদি করতে চান…

—নীরাজিতার ওপর রাগ ভুলে গিয়েছি; বিশ্বাস করুন।

প্রতিভা হাসে—বিশ্বাস করলাম।

—তাহ'লে তোমার আপত্তি করবার কি আছে?

চমকে ওঠে প্রতিভা—মাপ করবেন।

—তাহ'লে বল চরিত্রহীনকে তুমি ঘেন্নাই কর।

—না।

—ভয় কর।

—না।

—তবে?

—আমার কথা তুলছেন কেন? আমার কথা আমি ভাবছি না।

—তার মানে?

—আপনার কথা। আপনি কিছু জানেন না বলেই বোধহয় ভয় পাচ্ছেন না, তাই হঠাৎ শুধু চোখের দেখা দেখে শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—সব কিছু জানলেও বোধহয় ভয় পাব না।

—অসম্ভব।

—না।

—নিশ্চয়।

—কেন?

—আপনি পুরুষ।

—চরিত্র নিয়ে বড়াই করে না সেইরকম পুরুষ।

—কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে বড়াই করতে না পারলে মনে মনে মরে যাবেন!

—তোমার মত মেয়ে যদি স্ত্রী হয়, তবে···

—আপনি খুবই ভুল কথা বলছেন, নিশীথবাবু; আর অনর্থক আমাকে দিয়ে বেহায়ার মত অনেক কথা বলিয়ে নিচ্ছেন।

—তুমিই ভুল করছো, প্রতিভা। তোমাকে দিয়ে তোমার

কোন ইতিহাস বলিয়ে নিতে চাই না। শুধু বিশ্বাস করতে বলি।

—কি ?

—চরিত্রের অহংকার নেই, এমন মেয়েকেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

—কেন ?

—আমার চরিত্রের অহংকার নেই বলে।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। যেন প্রতিভার এতক্ষণের বাচালতা হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেয়ে নয়; প্রতিভা দত্তের এই হেঁট-মাথার ভঙ্গীটা যেন বিচিত্র এক অভিবাদনের আবেশে হঠাৎ কোমল হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। নিশীথ রায় নামে এই ভদ্রলোকের, যাকে এক ঘণ্টা আগেও চিনতো না, যার নামও কোনদিন শোনেনি প্রতিভা দত্ত, তার ইচ্ছার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হতে হয়। প্রতিভা দত্ত নামে একটি মেয়ের জীবনের কোন গৌরবের কথা, কোন গুণের কথা শুনতে পাননি ভদ্রলোক। শুধু সে-মেয়ের জীবনের এক ভয়ানক স্বীকৃতির কথা শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু তবু একটু ভয় নেই, একটুও কুণ্ঠা নেই। সেই মেয়েকেই ভালবাসতে চান। চরিত্র নিয়ে অহংকার করবার অধিকার নেই যে-মেয়ের, সে-মেয়ের চরিত্রটা কি-রকমের, এটুকু না বুঝবার মত মূর্খ নন ভদ্রলোক। কিন্তু…তবু…কি আশ্চর্য, চরিত্রে ক্ষত আছে, শুধু এটুকু জেনেই ভালবাসার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। খামখেয়ালী ভদ্রলোক, মাথা-খারাপ ভদ্রলোক। কিন্তু বুঝতে পারে প্রতিভা দত্ত, নিজেরই বুকের দুরুদুরু চঞ্চলতার ভাষা বোধহয় বুঝতে পারে, ভদ্রলোকের এই খামখেয়ালের দাবি যে প্রতিভা দত্তেরই জীবনের জন্য দুর্লভ এক শ্রদ্ধার ঘোষণা হয়ে বেজে উঠেছে।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের অহংকার মিথ্যে করে দিয়েছে যে ঘটনা, একটা-দুটো ঘটনা নয়, অনেক অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত দৃষ্টি, অদ্ভুত চিঠি আর…একটা ভয়ানক অদ্ভুত স্পর্শ, সবই যে প্রতিভা দত্তের ভাবনা

ও অনুভবের স্তরে স্তরে আজও নানা ধিক্কার, নানা আক্ষেপ আর নানা লজ্জা ছড়িয়ে রেখেছে।

এই ভদ্রলোক কল্পনাতে যত বড় একটা সন্দেহকে ধারণা করতে চেষ্টা করুন না কেন, এ ধারণা করতে পারছেন না যে, মাত্র এক বছর আগে, চরিত্রবান এক শিক্ষিত ভদ্রলোক শিবদাস দত্তের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেননি। বরং ভয় পেয়ে, ঘৃণা করে, এবং রাগ করে হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। শীতল সরকারের ঐ অলক্তক আজ নিশীথ রায়কে যে-ধরনের ঠাট্টা আর অপমান করেছে, শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভাকেও যে প্রায় সে-ধরনেরই একটা বিদ্রূপে আহত হয়ে একদিন এই ডালিয়ার বাগানের নিভৃতে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। এবং ঐ শিবদাস দত্তও বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে আছাড়-খাওয়া ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের সব আয়োজনও ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি চিঠি পেলেন শিবদাস দত্ত, বিয়ে করতে রাজী নন সেই ভদ্রলোক, সেই চমৎকার শিক্ষিত ইয়ংম্যান। ভদ্রলোক নিজেই অত্যন্ত শক্ত ভাষায় শিবদাস দত্তকেও ভর্ৎসনা করে চিঠি দিয়েছিলেন: আশা করি আমার আচরণে বিস্মিত না হয়ে নিজের মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে সাবধান হতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিভা দত্তের চরিত্রের কোন ঘটনার গল্প শুনতে পেয়ে বিয়ের জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল সেই ভদ্রলোক হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন, আজও কল্পনা করতে পারে না প্রতিভা। হ্যাঁ, অসম্ভব নয়, প্রতিভা দত্তের হাতের লেখা এমন চিঠি পৃথিবীর কোথাও হয়তো আজও আছে, যে-চিঠির ভাষা প্রতিভা দত্তের চরিত্রের রূপ ধরা পড়িয়ে দিতে পারে। সন্দেহ হয়েছিল প্রতিভার, প্রায় সাত বছর আগে মধুপুরে লেখা সেই চিঠিগুলি কি ? মিথ্যে নয়, এক বিন্দুও মিথ্যে নয়,

মধুপুর থেকে চিঠি পাওয়ার আশায় দিন গুনতো প্রতিভা, এবং মধুপুরে চিঠি লিখতে ভাল লাগতো।

জীবনের অতীতের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি আজ এই মুহূর্তে প্রতিভা দত্তের চোখের উপর দিয়ে যেন চকিত মিছিলের মত ছুটে চলে যায়। এই রাজপোখরা থেকে মোটরগাড়িতে একটানা দৌড়ে পথ পার হয়ে রাঁচি পৌঁছে হোটেল-মিরাণ্ডার বারান্দায় বসে এক পেয়ালা চা খেতে হলো; তার পর হাজারিবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে চুটুপালু পাহাড়। পথের কত বাঁক পার হয়ে, সমস্ত খাড়াই পথটা গাড়ির দোলানির সঙ্গে হাসতে হাসতে পার হয়ে একেবারে চুটুপালুর মাথার উপরে এসে থামতে হয়েছিল। নীচের শালবন সবুজ রঙের পাতলা বনাতের মত দেখায়। ঝরনাগুলি সরু সরু রেখার মত। শোভেন্দুর সঙ্গে সেই একটি দিনের জন্য অত দূরে বেড়াতে যেতে দিতে শিবদাস দত্তও কোন আপত্তি করেননি। এবং আজও ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন চুটুপালুর মাথার উপরে সেগুনের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে, এবং কোন কথা না বলে শোভেন্দু হঠাৎ প্রতিভার কাঁধে হাত রেখেছিল। ভুলে যায়নি প্রতিভা, সেদিন শিউরে উঠেছিল প্রতিভা, শোভেন্দুর হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়েছিল। এবং ফিরবার পথে শোভেন্দুও প্রতিভার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। কে জানে শোভেন্দুর সেদিনের রাগ হয়তো আজও পৃথিবীর এখানে ওখানে প্রতিভার চরিত্রের নামে ভয়ানক গল্প রটিয়ে বেড়ায়!

*

রাজগীরে বেড়াতে যেতে হয়েছিল একবার। শিবদাস দত্ত ছিলেন; সে-সময় প্রতিভা দত্তের মা বেঁচে ছিলেন, এবং তিনিও সঙ্গে ছিলেন। আজও স্মরণ করতে পারে প্রতিভা, সেই ভদ্রলোকের নাম বিকাশ; বিলেতে গিয়ে সার্জারির পরীক্ষায় পাস করে এবং তিন চারটে সোনার মেডাল নিয়ে দেশে ফিরেছে সেই বিকাশ। রাজগীরে বাড়ি ভাড়া করে বাবা মা আর অনেকগুলি ভাইবোনের

সঙ্গে প্রায় একটা মাস রাজগীরে ছিল বিকাশ। সেই মস্তবড় পাথরটা, জরাসন্ধের বৈঠক, তারই কাছে রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে ফিরে বেড়াতো বিকাশ। প্রতিভাও বেড়াতে যেত ; এবং বিকাশের সঙ্গে রোজই দেখা হতো। কিন্তু আলাপ হয়নি। তবু অস্বীকার করে না প্রতিভা, এবং আজও স্মরণ করতে পারে, বিকাশকে দেখতে ভাল লাগতো। সন্ধ্যা হলে এক এক দিন এমন কথাও মনে হয়েছে, এতক্ষণে .বোধ হয় জরাসন্ধের বৈঠকের কাছে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকাশ।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, অস্বীকার করে না প্রতিভা, ইচ্ছে করে হোক কিংবা অনিচ্ছাসত্বে হোক, মনটা অনেকবার উঁকি দিয়ে পৃথিবীর অনেক সুন্দর মুখ দেখেছে। কোন কোন দেখার অনুভব মনের কোণে রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে। এবং সেজন্য নিজের উপর কোন মুহূর্তে এতটুকুও রাগ হয়নি।

বুঝতে পারেনি প্রতিভা, কতক্ষণ এভাবে এক ঠাঁই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে ; এবং বুঝতে পারে প্রতিভা নিশীথ রায়ও এক পা নড়েনি। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিশীথের পায়ের হরিণের চামড়ার চটি একেবারে স্তব্ধ হয়ে পথের মাটির সঙ্গে লেগে রয়েছে, একটু উসখুস করে না।

জানে না, কোন দুঃস্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না এই নিশীথ রায়, প্রতিভা দত্তের এই শরীরের স্নায়ু ও শিরার ভিতর আজও মাঝে মাঝে যে বিদ্রূপের শিহর তপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। কিন্তু এর জন্য নিজের উপর ছাড়া আর কারও উপর প্রতিভা দত্তের মনে কোন অভিযোগ নেই। যদি ঘৃণা জাগে, সে ঘৃণা নিজেরই জীবনের একটা শুভ বিশ্বাসের প্রগলভতার বিরুদ্ধে। সেই বিশ্বাসের আনন্দকে একটু সামলে রাখবার মত মনের জোর পায়নি, সে ভুল নিজের ভুল ছাড়া আর কারো ভুল নয়।

ভালবাসতে হলে শুধু মন প্রাণ দিয়ে নয়, আরও কিছু দিয়ে ভালবাসতে হয়, এ কথা তিন বছর আগের প্রতিভা দত্তকে কেউ কানে কানে বলে শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু মিহির মিত্রের সঙ্গে এক বছরের চেনাশোনার পর যেন নিজেরই নিশ্বাসের মধ্যে এই কথা শুনতে পেয়েছিল প্রতিভা। কিসের অন্যায়? কেন ভুল হবে? ক্ষতি কি? যার সঙ্গে সারা জীবন আপন হয়ে থাকতে হবে, স্বামী হবে যে, মনে প্রাণে ভালবেসেছে যে, দেখা হলেই একটা চরম সান্ত্বনা পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে, তার বুকের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিতে আপত্তি হয়নি প্রতিভার। প্রতিভা নিজেই আজ আশ্চর্য হয়ে যায়, আজকের এই ভীরু শরীরটা কেমন করে সেদিন এত দুঃসাহস পেয়েছিল? তিন বছর আগে কলকাতার বাড়িতে সেই একবছরের জীবন যেন একটা একটানা উৎসবের মত পার হয়ে গিয়েছিল।

সেই মিহির মিত্র বিলেত চলে যাবে, কোনদিন এরকম বিচ্ছেদের অভিশাপ কল্পনা করতে পারেনি প্রতিভা। মিহির মিত্র বিলেতে থাকতেই একটা বিয়ে করে ফেলবে, এমন আশঙ্কা কখনও প্রতিভা দত্তের কোনক্ষণের দুর্ভাবনার মধ্যেও দেখা দেয়নি। যেদিন প্রথম খবরটা শুনেছিল প্রতিভা, সেদিন খবরটাকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। কিন্তু মিহির মিত্রের একটি চিঠি এসে প্রতিভা দত্তের ভুল ভেঙে দিয়েছিল। মিহির মিত্র দুঃখ প্রকাশ করেনি; বরং যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে চিঠিটা লিখেছিল: কিছু মনে করো না, প্রতিভা, এবং বিশ্বাস কর, তোমাকে ভয় পেয়ে আমি বিলেত পালিয়ে এসেছি, এবং বিয়ে করেছি।

কিসের ভয়? এই প্রশ্নের উত্তরও ছিল সেই চিঠিতে। প্রতিভা দত্তের চরিত্রকেই ভয় পেয়েছে মিহির মিত্র: আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি, তবু তুমি ও-ভুল কেন করলে, প্রতিভা? যেটা বিয়ের পরে হওয়া উচিত, সেটা···ছিঃ···তুমিই বুঝে দেখ, তার পর তোমার জন্য আমার মনে কোন আগ্রহ আর থাকতে পারে কি?

মিহির মিত্রের চিঠিটাকে একটা মাস হাতের কাছে রেখেছিল প্রতিভা। চিঠিটাকে বার বার পড়ে যেন নিজের জীবনের শেষ গর্বটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেষ্টা করতো। এবং একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে বিছানার উপর উঠে বসে ভুতে-পাওয়া মানুষের মত রেগে কেঁদে আর হেসে-হেসে চেহারাটাকে আধমরা করে ফেলেছিল প্রতিভা। মিহির মিত্রের ভালবাসা মিথ্যে হয়ে গেল, সেজন্য নয়। মিহির মিত্র অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করলো, সেজন্য নয়। নিজেকে ঘৃণা করেছিল প্রতিভা। বুকের পাঁজর-গুলিতে দিনরাত একটা আতঙ্ক যেন যন্ত্রণা দিয়ে প্রশ্ন করতো, চরিত্র হারালে কেন, প্রতিভা? ছিঃ!

রাজপোখরার বাড়িতে এসে তিন বছরের মধ্যে প্রতিভা দত্তের পাঁজরভাঙা সে আতঙ্ক অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতিভা দত্তের জীবনটাই শান্ত হয়ে গিয়েছে। একটি সত্য বুঝে নিয়েছে প্রতিভা, মানুষকে ভালবাসার নিয়ম সে জানে না। ভালবাসতে গিয়ে এত ভুল করে যে মেয়ে, পৃথিবীর কাউকেই তার আর ভালবাসতে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, কাউকে ভালবাসার অধিকারও তার নেই। তার পক্ষে কারও স্ত্রী হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীর কারও উপর রাগ নেই, কোন অভিযোগও নেই প্রতিভার। এমন কি, এক বছর আগে প্রতিভাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠেও শেষ পর্যন্ত প্রতিভার চরিত্রকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর উপরেও না। সে ভদ্রলোকের অপরাধ কোথায়? সে ভদ্রলোক যে ঘৃণার কথা চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন, সে ঘৃণা যে একেবারে রক্তমাংসের ঘটনা দিয়ে গড়া বাস্তব সত্য। কে জানে, হয়তো দূর বিলেত থেকে মিহির মিত্রের জীবনের একটা একবছরের নিছক রোমান্সের গল্প প্রতিভা দত্তের চরিত্রটাকে ঠাট্টা করবার জন্য চারদিকে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে এই লাক্ষার দেশে, এই ম্যাঙ্গানিজ ফায়ার-ক্লে আর কেওলিনের

দেশে এসে পড়েছে। ভালই হয়েছে নিজেকে চিনতে পেরেছে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ এইভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে এই নীরব ভাবনার অভিনয় করতে গিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। আর দেরি করা উচিত নয়। চা-এর আসরে এতগুলি মানুষ অপেক্ষায় চুপ করে বসে আছে, তারাই বা কি ভাবছে? বেণুও বোধহয় আবার এখনি ছুটে আসবে। নিশীথ রায়কে স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভাল, না, আর এভাবে আপনি আমাকে অকারণে পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না।

ভুল করছে, খুব অন্যায় করছে নিশীথ রায়। প্রতিভা দত্ত যেন জোর করে মনের ভিতর নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি, মুখের ভাষা আর এই থমকে-থাকা শক্ত চেহারাটার উপর রাগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাও বোধহয় বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে; তাই থেকে থেকে হঠাৎ কেঁপে উঠছে প্রতিভা দত্ত, এবং এতক্ষণে নিজেরই মনের একটা নতুন ভুলের রকম চোখে পড়ছে। না, নিশীথ রায়কে শুধু চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে নয়; প্রতিভা দত্তের প্রাণের একটা আহত গৌরবের দুঃসহ বেদনা যেন একটা আবেগে ছুটে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। দেখতে ইচ্ছা হয়েছে, চরিত্রহীন মানুষ সত্যিই দেখতে কেমন? ভালবাসার মানুষের কাছ থেকে ঘৃণার আঘাতে পীড়িত হলে চোখে মুখে যে বেদনা ফুটে ওঠে, সেই বেদনাই বা দেখতে কেমন?

কিন্তু আসা উচিত হয়নি। কোন দরকার ছিল না। আর এই বুদ্ধিমান নিশাথ রায়ের ধূর্ত প্রশ্নের কাছে নিজেকে এমন করে ধরা পড়িয়ে দেবারও কোন দরকার ছিল না।

—চলুন।

কথাটা বলেই আস্তে আস্তে মুখ তোলে প্রতিভা, আর যেন জোর করে মনের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে সাবধান করে দিয়ে আবার

সেই সামান্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে।—অনেক দেরি হয়ে গেল, সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু তুমি আমাকে একটি কথা দাও, প্রতিভা।

—পারবো না। মাপ করবেন।

—তা হলে, আমার অন্য একটা কথা শোন।

—বলুন।

—তুমি যদি রাজী না হও···

—নীরাজিতাকে এত শিগগির ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—ভুলে গিয়েছি, ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারবো না।

—নিজেকে বৃথা কষ্ট দেবেন কেন?

—তাই ভাল লাগবে।

তাহ'লে একজনের ওপর যে ভয়ানক অন্যায় করা হবে।

—কার ওপর?

—স্ত্রীর ওপর।

—কার স্ত্রী?

—আপনার।

—আমার স্ত্রী কেউ হবে না। কোন কালেই হবে না।

—তার মানে, আপনি বিয়েই করবেন না?

—না। শুধু তুমি যদি হও···

আঁচল তুলে চশমা-সুদ্ধ চোখ ঢেকে ফেলে প্রতিভা দত্ত। নিশীথ রায় চমকে ওঠে। কি হলো প্রতিভা?

—কিছু না।

—তবে একটি কথা বল, প্রতিভা। হ্যাঁ কিংবা না।

—হ্যাঁ।

প্রতিভা দত্তের একটি হাত ধরবার জন্য হাত এগিয়েই হাতটাকে সামলে নেয় নিশীথ রায়, এবং ব্যস্ত হয়ে বলে, চল—

শিবদাস দত্তের বাঙলোবাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটার ভিতরে চা-এর আসরও যেন মনে মনে আশা-নিরাশার বড় কঠিন একটা দ্বন্দ্ব সহ্য করছিল। কাকিমার চোখের চেহারা দেখে মনে হয়, তিনি যেন প্রাণপণে আশা ধরবার চেষ্টা করছেন। বার বার বারান্দার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেন। আসছে কি নিশি? সত্যিই নিশিটা একবার ভুল করেও এদিকে এসে পড়বে না কি? যদি আসে তবে …কাকিমা আবার তাঁর মনের অদ্ভুত একটা ইচ্ছাকে যেন জোর করে সাহস দিতে থাকেন। কেন, সম্ভব হবে না কেন?

কিন্তু নিশীথ আসছে না। আসবে বলে মনে হয় না। প্রতিভার অনুরোধও কি ব্যর্থ হয়ে গেল? নিশিটার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, যদি ভদ্রতাবোধ থেকে থাকে, তবে প্রতিভার অনুরোধ রক্ষা না করে থাকতে পারবে না। মেয়েটা নিজেই গিয়েছে নিশিকে ডেকে আনবার জন্য; নিশিরও তো একটু বোঝা উচিত।

চা-এর আসরে কাটা-ফলে সাজানো ডিসগুলি চুপ করে পড়ে আছে। কেক-বিস্কুটের একটা স্তূপ, পাঁউরুটির শ্লাইসের দুটো স্তূপ, আর দুটো প্লেটের উপর মাখনের দুটো বড় চাকা, সবই যেন অপেক্ষায় থেকে থেকে প্রায় হতাশ হয়ে মিইয়ে আসছে।

শিবদাস দত্ত গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কোমরে ন্যাপকিন জড়িয়েছেন। এবং জেঠামশাই-এর আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের হাতেই লুচি ভেজে ও আলুর দম রেঁধে ফেলেছেন।—আপনারা যখন দয়া করে এতটা সময় থেকেই গেলেন, তখন কি শুধু আর চা-বিস্কুট দিয়ে আপনাদের…না, সে হতে পারে না। আপনি জানেন না, আমি একটি ওস্তাদ রাঁধিয়ে এবং আমার রান্নার সুনাম আছে।

কাকিমা হেসে হেসে আপত্তি করেছিলেন।—যদি নিতান্তই লুচি আলুর দম খাওয়াতে চান, তবে আপনি কেন…

শিবদাস দত্ত বলেন—প্রতিভার কথা বলছেন? হাসালেন!

ও মেয়ে রান্নাবান্না জানেই না; তা ছাড়া, আমার মতো ভাল র‍াঁধতে ওর সাধ্যি কি! ও তো দূরের কথা, ওর মা'রও কোনোদিন সাধ্যি হয়নি।

কাকিমা হাসেন।—না না, আমি প্রতিভার কথা বলছি না। আমি বলছি, আমিই তো পারি।

—আপনার হাতের রান্না খাবার সৌভাগ্য অস্বীকার করবো না। মাথা পেতে স্বীকার করবো। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি আমার হাতের রান্না আপনাদের খাওয়াবার সৌভাগ্য ছেড়ে দেব না।

শিবদাস দত্তই বাড়ির ভিতরের বারান্দায় একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আর স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করেছেন। সত্যিই আধঘণ্টার বেশি সময় নেননি শিবদাস দত্ত। শিবদাস দত্তের কাণ্ড দেখে জেঠামশাই, কাকিমা আর বেণুর হাসাহাসি থামতে না থামতেই লুচিভাজার গন্ধে ভরে গেল বাঙলোবাড়ির বাতাস।

বেণুর হাত ধরে প্রতিভা চলে যাবার পরেই কাকিমার মনটা যেন একটা আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথা ভেবে ফেলেছে। এমন কি একবার জেঠামশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছেন কাকিমা, চক্রবর্তী মশাই গেলেন কোথায়?

ড্রাইভার মুনিরাম বলে, এই রাজপোখরাতেই আছেন; কালী-মন্দিরের সেবাইত উনকা কুটুম আছেন।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়েও শুধু একটি কথা ভেবেছেন কাকিমা। কাকিমার মনের ভিতরে যেন একটা জেদ বার বার মুখর হয়ে কাকিমার ভাবনাকে আরও বিচলিত করে তুলেছে। বেশ মেয়ে; বেশ সুন্দর মেয়ে। শীতল সরকারের মেয়েটা কি দেখতে প্রতিভার চেয়ে ভাল? কখনই না। এ মেয়ের সঙ্গে যদি দুটো ভাল কথা না বলতে পারে নিশি, তবে বুঝতে হবে, নিশির চোখ

নেই। তাছাড়া, শীতল সরকারের ও তার মেয়ের এরকম ভয়ানক অমানুষিক ব্যবহারের পর আর ওদের কথা মনে রাখবারই বা দরকার কি নিশির?

জেঠামশাই-এর মনটা যে ভার হয়ে রয়েছে, সেটা তাঁর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে হাসছেন বটে, এবং শিবদাস দত্তের প্রীতি, ভদ্রতা আর অকপট ব্যবহারের রকম দেখে বেশ খুশি হয়ে যাচ্ছেন ঠিকই; কিন্তু শীতল সরকারের অদ্ভুত ব্যবহারের আঘাতটা সহ্য করতে গিয়ে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেঠামশাই। তাঁর মনের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে দু-একটা হঠাৎ প্রশ্নের মধ্যে যেন তাঁরও একটা আশার দুঃসাহস ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে জেঠামশাইও বলেছেন, শিবদাস-বাবুর মেয়ে, এই প্রতিভার মতো মেয়ে···বাস্তবিক···ওর মুখের একটি কথা শুনেই আমি বুঝে ফেলেছি, এ-মেয়ের মন যেন···যাকে বলে সোনার খনি!

জেঠামশাইও বার বার বারান্দার দিকে তাকিয়েছেন। তাঁরও চোখে ঐ একই প্রশ্ন—নিশি আসছে কি? আসবে তো নিশি? প্রতিভার অনুরোধের দাবি ঠেলতে না পেরে নিশি যদি এখানে চা-এর আসরে এসে বসে, তবে···তবে অন্তত এইটুকু বোঝা যাবে যে, একেবারে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

শিবদাস দত্ত তাঁর কোমরের ন্যাপকিন খুলে রেখে চাদর গায়ে দিয়ে চা-এর টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসেন। এবং টেবিলের উপর সাজানো খাবারের স্তূপের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হয়ে বলেন—যাক, আপনারা যে আমাকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু করবার সুযোগ দিলেন ডাক্তারবাবু, তার জন্যে আপনাদের সহস্র ধন্যবাদ।

জেঠামশাই বলেন—আমাদের ধন্য করে দিলেন বলুন।

শিবদাসবাবু হঠাৎ গম্ভীর হন।—না ডাক্তারবাবু। আপনারা

জানেন্ না, আজ আপনাদের একটু আপ্যায়ন করে আমি আমার একটা ভয়ানক দুঃখকে শান্ত করবার সুযোগ পেয়েছি।

জেঠামশাই আশ্চর্য হন। —আপনার দুঃখ? আপনার মতো মানুষকেও ভগবান দুঃখ দেন কেন, জানি না মশাই!

শিবদাস দত্ত হাসেন।—ঠিক আপনারা আজ অকারণে যে দুঃখটা পেলেন, প্রায় সেইরকম একটা দুঃখ।

—তার মানে? জেঠামশাই-এর গম্ভীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীব্র হয়ে ওঠে।

শিবদাস দত্ত বলেন—প্রতিভা এখন সামনে নেই তাই বলছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, মশাই। মেয়েটার বিয়ের সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে। বেশ ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যেদিন বিয়ে হবার কথা, ঠিক সেদিনই সকালবেলা ছেলেটির কাছ থেকে একটা ভয়ানক চিঠি পেলাম, বিয়ে করতে সে রাজী নয়।

—কেন? ছেলেটার এরকম মাথা খারাপ হলো কেন? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা।

শিবদাস দত্ত হাসতে হাসতে চাদর তুলে চোখদুটো বেশ ভাল করে ঘষে নিয়ে বলেন—মাথা খারাপই হয়েছিল বোধ হয়, নইলে ওরকম চিঠি লিখতে পারতো না। যাই হোক; আমিও একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছি।

—কি রকম? প্রশ্ন করেন জেঠামশাই।

—তার মানে মেয়েটাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

—বুঝলাম না, শিবদাসবাবু।

—মেয়েটা বিয়েই করবে না। আমিও বলি, তাই ভাল।

কাকিমার মুখটা করুণ হয়ে ওঠে।—এ কি বলছেন? এরকম জেদের কোনো অর্থ হয় না। এ তো চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।

শিবদাসবাবু হাসেন।—যাই হোক, তাই বলছি, আপনারাও

কিছু মনে করবেন না। শীতলবাবু ভয়ানক ভুল করলেন মনে হচ্ছে, এবং আপনাদেরও মনের উপর একটা আঘাত লাগলো; কিন্তু সেজন্য বিমর্ষ হয়ে পড়বেন না।···হ্যাঁ. আপনাদের ছেলেটির কি যেন নাম?

—নিশীথ।

—হ্যাঁ, নিশীথেরও উচিত এসব ভুলে গিয়ে, বেশ খুশিমনে আবার···অর্থাৎ রাগ করে চিরজীবন নিজেকে ঠকিয়ে রাখবার কোনো অর্থ হয় না।

হেসে ফেলেন কাকীমা।—আপনাকেও তো ঠিক এই কথাই আমরা বলছি।

—আজ্ঞে?

—প্রতিভা বিয়ে করবে না কেন, এবং আপনিই বা প্রতিভার বিয়ে দিতে উৎসাহ বোধ করবেন না কেন?

শিবদাসবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেন—আমার কথাগুলি কেমন যেন হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আপনাদের কাছে বোধহয় খুব বাজে কথা বলে মনে হচ্ছে···কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, আমি সত্যিই বড় ভয় পেয়েছি, ডাক্তারবাবু।

শিবদাসবাবুর মুখের সেই বেদনার দিকে তাকিয়ে জেঠামশাই ও কাকিমা দু'জনেই বেদনাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে যান। নিশীথকে ডাকতে গিয়েছে প্রতিভা; এবং এখনও দু'জনের একজনও আসছে না। কী এত কথা বলছে প্রতিভা? কী এত কথা বলছে নিশি? দু'জনে বোকার মতো একটা বাজে তর্ক বাধিয়ে ঝগড়া করছে না তো? ভগবান জানেন! কিন্তু যদি ঝগড়া-টগড়া বা বাজে তর্ক না করে থাকে, যদি একটু বুঝে দেখে যে, ওদের দু'জনের জীবনে একটা মিল আছে, একটা দুঃখের মিল, তবে দু'জনের জন্য দু'জনেরই মনে কি কোনো মায়া দেখা দেবে না? বেচারা শিবদাস দত্তের এই স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটো এখনই হেসে উঠতে পারে, যদি শোনা যায় যে···

কে এল ?

না, নিশি নয়। প্রতিভাও নয়। হঠাৎ এসে চা-এর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে বেণু। কাকিমা বলেন—নিশি আসবে না ?

বেণু চিন্তিতভাবে বলে—আসবে বোধ হয়।

—প্রতিভা কোথায় ?

বেণুর মুখটা যেন দুশ্চিন্তার বাধা তুচ্ছ করে হঠাৎ হেসে ওঠে।—প্রতিভাদির সঙ্গে বড়দার তর্ক শুরু হয়েছে।

শিবদাসবাবু বিব্রতভাবে বলেন—তর্ক ? ছিঃ, এসব প্রতিভার খুবই অন্যায়···আমি যাচ্ছি।

জেঠামশাই ও কাকীমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—না না না। আপনি যাবেন না।

—নিশীথ বেচারার মন একে তো লজ্জিত ও দুঃখিত, তার ওপর যদি কেউ গিয়ে তর্ক করে বেচারাকে বিরক্ত করে, তবে··· আমিই একবার যাই, ডাক্তারবাবু।

জেঠামশাই হাসেন—আপনি কেন যাবেন ?

—নিশীথের চা আর খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাকিমা হাসেন—না। যদি নিশি না আসে, যদি খাবার পৌঁছতেই হয়, তবে খাবার পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবে না। আমি আছি, চঞ্চল আছে, দেবেশ আছে।

—তাহলে আপনারা খেতে আরম্ভ করে দিন। আমি নিশীথের অপেক্ষায় থাকি।

বারান্দার উপর ছায়া দেখতে পেয়ে আর পা-এর শব্দ শুনে হেসে উঠলেন কাকিমা।—না, আপনাকে আর অপেক্ষা করতে হলো না।

নিশীথ আর প্রতিভা এসেছে। নিশীথের মুখটা শান্ত ও প্রসন্ন, প্রতিভা গম্ভীর। কাকিমার মনের একটা সাধের সন্দেহ যেন খুঁটে খুঁটে দু'জনের মুখের ভাবের রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই

বুঝতে পারেন না কাকিমা। তাঁর চোখের চাহনিতে আশা-নিরাশার সেই দ্বন্দ্বই চলতে থাকে। একবার আশা হয়। এবং পরমুহূর্তে সেই আশাকেই সন্দেহ করেন। না, এত সহজে এবং এত তাড়াতাড়ি কিছু আশা করা যায় না। নিশীথ আর প্রতিভা, দু'জনে দুটি বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে তো নয় যে, পাঁচ মিনিটেই চেনাশোনার মায়াতেই মনে-প্রাণে বন্ধু হয়ে যাবে।

জব্দ হোক শীতল সরকার ও তাঁর মেয়ের অহংকার, কাকিমার মনে এরকম একটা জেদের দাবি যে ছটফট করছিল না, তা নয়। রাজপোখরা থেকে ফিরে যাবার আগে যেন শুধু অসহায় একটা বেদনার ভার নিয়ে ফিরতে না হয়, শীতল সরকারের জন্য একটা পাল্টা বিস্ময়ের আঘাত রেখে দিয়ে চলে যেতে পারলেই ভাল ছিল; কাকিমার কল্পনার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার একটা কঠোর আগ্রহের দাবীও বার বার জোর করে উঠছিল ঠিকই। কিন্তু শুধু সেজন্য বোধহয় নয়। নিশীথের হঠাৎ আহত জীবনের বেদনার দাগটাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে, ছেলেটাকে হাসিয়ে আর সুখী করে ফিরিয়ে নেবার জন্য মনের ভিতর একটা মায়ার দাবিও বার বার জোর করে উঠছিল। কিন্তু শুধু সেজন্যও বোধহয় না। প্রতিভা মেয়েটাকে দেখতে বড় ভাল লেগেছে, একটু মায়াও পড়ে গিয়েছে ঠিকই। এটাও একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়, যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে পড়ে আশা করতে চেষ্টা করছেন কাকিমা, আজই এই মুহূর্তে প্রতিভারই সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাক না।

কাকিমার এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয়। কিন্তু সে দুঃখ ভুলে যেতেও পারবেন। একমাস দু'মাস বা দু'বছর পরে, একদিন না একদিন পৃথিবীর কোন মেয়ের সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাবে। নীরাজিতার চেয়ে অনেক সুন্দর ও অনেক ভাল মেয়ের সঙ্গে, এবং হয়তো এই প্রতিভার চেয়েও ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে নিশীথের। নিশীথের জন্য দুঃখ করবার এবং শীতল সরকারকে

জব্দ করবার কথা চিন্তা করবার আর কোন দরকার হবে না। কিন্তু …কাকিমা বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকেন, এবং জেঠামশাই দু'একবার অপলক চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন, শিবদাস দত্তের ঐ স্যাঁতসেঁতে চোখ, বার বার চাদর দিয়ে ঘষে যে চোখ-দুটোকে লাল করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। কে জানে কোন অভদ্রর কাছ থেকে হঠাৎ একটা অপমানের মার খেয়ে ভদ্রলোকের জীবনটাই আতঙ্কে ভরে গিয়েছে! মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেই ভয় পান। মেয়ের বিয়ে হবেনা বলেই মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তার মানে, সেই অপমানের দুঃখটাকেই চিরস্থায়ী করে মনের মধ্যে পুষে রেখে চোখ-দুটোকেই স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছেন।

শিবদাস দত্তের ঐ চোখের সজলতা একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর হাসিয়ে দিতে পারা যায় না কি? ভগবান কি সহায় হবেন? যে কথা ভাবেন জেঠামশাই, সেই কথা ভাবেন কাকিমা। শিবদাস দত্তের মতো একটা সরল প্রাণের মানুষ সুখী হবে, অন্তত এইজন্য প্রতিভার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যান কাকিমা। না, ও মেয়ের মুখটা বড় বেশি বিষণ্ণ। বোধহয় মানুষকে বিশ্বাস করবারই সাহস হারিয়েছে এই মেয়ে।

চা ও খাবারের সৎকার শুরু হয়। শিবদাস দত্ত টেবিলের এদিকে ওদিকে ঘুরে চেঁচামেচি করেন। চঞ্চল আর দেবেশের ডিসে গাদা গাদা লুচি ঢালতে থাকেন। প্রতিভাও টেবিলের একদিকে টি-পট ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কাকিমা দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে যান, নিশীথও কোন সংকোচ না করে, বরং চঞ্চল ও দেবেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাত চালিয়ে খাবার খেয়ে চলেছে।

কাকিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলে বেণু। চমকে ওঠেন কাকিমা। কিন্তু বেণু যেন ভয়ানক

আবদারের আবেগে দুরন্ত হয়ে কাকিমাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর দেরি কেন? কিসের অসুবিধা? বেণুর প্রশ্নগুলি কাকিমাকে ভয়ানক বিব্রত করছে। কাকিমা বলেন—আমাকে বিরক্ত করিস্ না। বাবাকে বল-না গিয়ে।

—কি? কি বলছে বেণু? প্রশ্ন করলেন জেঠামশাই।

বেণুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে জেঠামশাই-এর কানের কাছে সেই ভঙ্গীতে একটা দুরন্ত আবদারের দাবি ফিসফিস করে শুনিয়ে দিতে দিতে ছটফট করতে থাকে। চমকে ওঠেন জেঠমশাই। বিড়বিড় করে বলেন—তা আমি···আমি কি করবো রে বেণু!

কিন্তু বেণু হতাশ হয় না। চুপ করে জেঠামশাই-এর কোল ঘেঁষে বসে কি যেন ভাবে, তার পরেই উঠে গিয়ে প্রতিভার কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে প্রতিভার হাত ধরে।

প্রতিভা হাসে—কি বেণু?

প্রতিভার কানের কাছে কি যেন বলতে চায় বেণু। প্রতিভাও হেসে হেসে মাথাটাকে অনেকখানি নামিয়ে বেণুর মুখের কাছে কান পাতে। চমকে ওঠে প্রতিভা। এবং প্রতিভার মুখের সেই হাসি যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে কালো হয়ে যায়। প্রতিভার গলার স্বর এবং মুখের ভাষাও ভীরু স্বপ্নের ভাষার মতো বিড়বিড় করে।—আমাকে এসব কথা বলতে নেই, বেণু।

—তবে কাকে বলবো?

প্রতিভার প্রাণটা যেন আরও ভয়ানক একটা প্রশ্নের শব্দ শুনতে পেয়েছে। উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আর টি-পট ছুঁয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাগানের ডালিয়ার উপর বারান্দার বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে, অল্প হাওয়ায় ডালিয়াগুলির রঙীন শোভা দুলছে।

প্রতিভার মুখের এই নীরবতাও বেণুকে হতাশ করতে পারে না।

আস্তে আস্তে টেবিলের আর এক দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশীথের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় বেণু।—বড়দা!

—কি?

নিশীথের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বেণু।

হেসে ওঠে নিশীথ। সঙ্গে সঙ্গে কাকিমার মনের সব আশা যেন তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে হেসে ওঠে। এমন কি জেঠামশাই-এর মুখের গম্ভীরতাও হঠাৎ ফিকে হয়ে যায়।

বেণুর পিঠে হাত বুলিয়ে নিশীথ হাসে।—বেশ ভাল মেয়েটির মতো এখন তুমি চুপটি করে বসে থাক তো, বেণু?

কিন্তু বেণু চুপটি করে বসে না। বেণুর মনের ভিতরেও যেন একটা দুরন্ত জেদ আকুল হয়ে উঠেছে। রাগ করে বেণু—না, কখখনো চুপটি করে বসবো না। তোমার কোন কথা শুনবো না।

নিশীথের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বেণুও তার আশার দাবিকে একেবারে বিদ্রোহের ভঙ্গীতে ব্যক্ত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেসে ওঠেন শিবদাস দত্ত—কি হলো? বেণু-মা এত রাগ করে কেন?

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে।—প্রতিভাদির বিয়ে হবে কবে?

—আঃ—সত্যিই আস্তে একটা আক্ষেপ করে ওঠেন জেঠামশাই। বোকা মেয়েটা কী সাংঘাতিক একটা কথা মনের ঝোঁকের ভুলে বলে ফেলেছে। কাকিমাও বিব্রত বোধ করেন। এবং ঠিকই, যা আশংকা করেছিলেন দু'জনে, তারই প্রমাণ দেখতে পান। হো-হো করে হেসে উঠলেন শিবদাস দত্ত, এবং চাদর তুলে জোরে জোরে চোখ ঘষলেন।

চঞ্চল আর দেবেশকে আরও দু'বার লুচি আলুর দম সেধে দিয়ে শিবদাসবাবু এইবার চেঁচিয়ে তাঁর আর একটি অপরাধের জন্য মার্জনা চাইতে থাকেন। নিজের মনের বাতিক মেটাবার জন্য আপনাদের

তো এতক্ষণ আটক করে রেখে রাত করে দিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনাদের একটা দুর্ভোগে ফেললাম।

—কিসের দুর্ভোগ ?

—ধরুন, এখনি যদি রওনা হন তবে টাটা পৌঁছতে পৌঁছতে…

—আজ আর রাত করে টাটা পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে নেই। আমরা মাঝপথেই আজকের রাতটার মতো রেস্ট নেব।

—মাঝপথে মানে ?

—সিনির কাছাকাছি। নিশীথেরই ছেলেবেলার এক বন্ধু থাকে সেখানে। তার বেশ বড় কোয়ার্টার আছে। সে বেচারা কাজের চাপে পড়ে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি…অবিশ্যি না এসে ভালই হয়েছে। শীতলবাবুর অদ্ভুত ব্যবহারের রকম দেখে আমাদের মতো ওর আর দুর্ভোগ ভুগতে হলো না।

কাকিমা হাসেন—এলে অবিশ্যি আপনার লুচি আলুর দমের আনন্দ বেশ ভাল করে ভোগ করে যাবার সৌভাগ্য হতো সে বেচারার।

শিবদাসবাবু বললেন—আর একটা অনুরোধ করতে চাই, যদি সাহস দেন তো বলি।

জেঠামশাই হাসেন—নির্ভয়ে বলুন।

—আজকের রাতটার মতো এখানেই যদি থেকে যেতেন, তবে…

—আপনাকে সত্যিই এবার একটু ভয় করতে হচ্ছে, শিবদাসবাবু। আপনি আর এসব অনুরোধ করবেন না। আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে অনেক উপদ্রব করলাম; এবার আমাদের বিদায় দিয়ে খুশি হয়ে যান।

—মাঝরাত্রিতে হঠাৎ বন্ধুর বাড়িতে উঠলে, সে বন্ধু যতই বন্ধু হোক, তাকে একটু অসুবিধায় ফেলা হয়, এবং নিজেদেরও কষ্ট পাওয়া হয় নাকি ?

—নিশীথের বন্ধুটি সে-রকম বন্ধু নয়। প্রাণের বন্ধু বলতে যা বোঝায়, তাই। বিভূতির মতো ভাল ছেলে খুব কম দেখা যায়।

—বিভূতি? প্রশ্ন করেই শিবদাস দত্তের চোখের দৃষ্টিটা থমকে থাকে। আর, প্রতিভা দত্তের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

—খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজে কাজ করে বিভূতি। সিনির কাছে ওর একটা অফিস আর কোয়ার্টারও আছে। বিভূতির বাবা যোগেশ এখন বেঁচে নেই; যোগেশও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বিভূতিও তার বাপের জীবনের সবচেয়ে বড় 'গ্লোরি' যেটা ছিল, সেটা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে।

শিবদাসবাবু যেন আর্তনাদ করেন—কি সেটা?

—নিখুঁত চরিত্র, স্টেনলেস স্টীলের মতো চরিত্র। নিশীথও কতবার আশ্চর্য হয়ে বিভূতির কত সুখ্যাতির গল্প আমাদের কাছে করেছে। তাতেই বুঝেছি যে ওরকম নিখুঁত চরিত্রের ছেলে হয় না।

শিবদাসবাবু বলেন, এই বিভূতির সঙ্গেই প্রতিভার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, আর বিভূতিই চিঠি দিয়ে···

প্রতিভা দত্তের ছায়াটা ছটফট করে ওঠে। চা-এর আসর থেকে আস্তে আস্তে যেন আলগা হয়ে, তারপর একেবারে ঘর ছেড়েই চলে যায় প্রতিভা। জেঠামশাই আর কাকিমা শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন, বোকা হয়ে গিয়েছেন, নিজেদের মুখরতার লজ্জায় মনে মনে মরে গিয়েছেন দু'জনেই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ। চা-এর আসর থেকে সরে গিয়ে বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়ায়। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে, একটা কঠোর স্বরে চাপা আক্রোশ চাপতে না পেরে, ডাক দেয় নিশীথ, একবার শুনে যাও, কাকিমা।

বিচলিত হন, একটু আতঙ্কিতও হন কাকিমা, এবং সেই সঙ্গে যেন একটা আশার সাহসও কাকিমাকে ব্যস্ত করে তোলে। নিশীথের ডাকটা যেন দুঃখ রাগ ও যন্ত্রণার একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনির মতো বেজে উঠেছে।

কাকিমা উঠে গিয়ে নিশীথের কাছে এসে দাঁড়াতেই নিশীথ বলে, এখনি কি একটা বিয়ের ব্যাপার হয়ে যেতে পারে না?

কাকিমা চমকে ওঠেন, বিয়ে! তুই প্রতিভাকে বিয়ে করতে চাস?

—হ্যাঁ।

– কিন্তু প্রতিভা কি…

—প্রতিভা রাজী আছে। কিন্তু এখনি বিয়ে করতে রাজী হবে না বোধ হয়।

—খুব হবে। খুব হবে। রাজী করিয়ে ছাড়বো, বলতে বলতে প্রায় ছুটে চলে গেলেন কাকিমা। এবং বারান্দা থেকে নেমে ডালিয়া-বাগানের রঙীন ভিড়ের আশেপাশে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে নিশীথ। চোখ তুলে দেখতেও পায় নিশীথ, রাজ-পোখরার আকাশের মেঘের ঘটাও একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায় ঝড় আর কোথায় বিদ্যুৎ? খোলা আকাশের একদিকে একটুকরো চাঁদ ঝকঝক করছে।

বেণু ছুটে গিয়ে প্রতিভার হাত সেই যে ধরলো, ধরেই রইলো। হাত ছাড়লো তখন, যখন প্রতিভা বলতে বাধ্য হলো, হাত ছাড় বেণু, নইলে সাজবো কি করে?

চক্রবর্তী মশাইকে ডাকবার জন্য মুনিরামকে গাড়ি নিয়ে ছুটিয়ে দিয়ে জেঠামশাই সেই যে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ না চক্রবর্তী মশাইকে নিয়ে মুনিরাম ফিরে এল।

শিবদাস দত্ত চেয়ারের উপর বসে সেই যে ফুঁপিয়ে উঠলেন, তারপর থেকে চাদর দিয়ে চোখ ঘষতেই থাকেন; হেসে উঠলেন

তখন, যখন কাকিমা এসে কাছে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন, আপনার কিছু ভাবতে হবে না; আমরাই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

তবু পায়ে চটি, পায়জামা পরা আর গেঞ্জি গায়ে সেই চেহারার উপরেই চাদর ফেলে দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন শিবদাস দত্ত; এবং ফিরে আসতে আধ ঘণ্টাও সময় নিলেন না।

একে একে, রাজপোখরার আকাশের টুকরো চাঁদের আলোতে পথের ঝাউ-এর ছায়া পার হয়ে শিবদাস দত্তের ডালিয়া-বাগানের ধারে এসে দাঁড়ালেন যাঁরা, তাঁদের পরিচয়ও পেলেন জেঠামশাই। এসেছেন রাজেনবাবু আর জ্যোতিবাবু; হরবংশবাবু আর মিসেস ফস্টার। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী এসেছেন; তাঁর সঙ্গে অভয়া আর মঞ্জুলিকাও এসেছে। রাজেনবাবুর বড় ছেলে মাধবও এসেছে। মিসেস ফস্টার প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়েই চলে এসেছেন। হরবংশবাবুর হাতে রঙীন শাড়ির প্যাকেট দেখা যায়।

অভয়া আর মঞ্জুলিকার চটপটে হাতে উঠানের উপর প্রকাণ্ড একটা আলপানা আঁকা হতেই বা কতক্ষণ লেগেছিল? দেরি হয়নি। কোন কাজেরই দেরি হয়নি। মাধব তিনবার বাইরে দৌড়ে গিয়ে তিন বার ফিরে আসে; এবং একা হাতেই চা তৈরি করে আর খাবার পরিবেশন করে। রাজপোখরার ইতিহাসে এক অদ্ভুত হঠাৎ-উৎসবের সব ব্যস্ততাকে মিষ্টি করে দিতে মাধবেরও এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, কাকিমা যখন প্রতিভার সিঁদুর-আঁকা কপালটার দিকে তাকিয়ে হেসে-কেঁদে প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরেছেন, যখন উৎসবের মুখরতা একটু শান্ত হয়েছে আর মিসেস ফস্টার নবদম্পতিকে 'ব্লেসিং' জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তখন শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের কাছে একজন আগন্তুকের ছায়া এগিয়ে আসে। ছায়াটা ফটক পর্যন্ত এসে যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে থমকে যায়।

শিবদাস দত্ত ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেন—আসুন, আসুন শীতলবাবু!

শীতলবাবুর ছায়া আতঙ্কিতের মতো সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে, এবং প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়।

অলক্তকের মানুষগুলি কি ফিরে এসেছে? শিবদাস দত্ত বোকার মতো এবং ভয়ে-ভয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, ফিরে এসেছে বোধহয়। তা না হলে অলক্তকের জানালায় আলো ফুটে উঠবে কেন?

সেই মুহূর্তে পটপট করে, যেন একটা অন্ধকারের ধিক্কারে আহত হয়ে অলক্তকের আলোগুলি নিভে যায়।

লাক্ষানগর রাজপোখরার ঝাউ-এর মাথায় যখন সকালবেলার রোদ ঝলমল করে, তখন অলক্তকের বন্ধ দরজা ও জানালাগুলি আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। ততক্ষণে অলক্তকের বাইরের বারান্দাকে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দিয়েছে মালী। সেই আল-পনার এক কণিকা সাদা গুঁড়োও আর বারান্দার কোথাও নেই। ফটকের আমপাতার ঝালরও অদৃশ্য হয়েছে।

ঘরের ভিতরে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে শীতল সরকারের ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিও আর কোন আতঙ্কে ছটফট করে না। দূরে দলমা পাহাড়ের মাথা রোদে ছেয়ে গিয়েছে। আর নিকটে শিবদাস দত্তের বাঙলোর ডালিয়াবাগানও শান্ত হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে যেন একটা বিচিত্র খেয়ালের মাতলামিতে পাগল হয়ে শিবদাস দত্তের বাগানের ডালিয়াগুলি হেলে-দুলে কিনা কাণ্ড করেছে!

বাড়ির সবাইকে, সেই সঙ্গে নীরাজিতাকেও আদ্রা স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভিতরে কয়েকঘণ্টার অস্বস্তিকর অপেক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কলকাতার ট্রেনে চড়িয়ে দেবার পর, হাঁপ ছেড়েছিলেন শীতলবাবু। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তার পর নিজে

সেই ওয়েটিং-রুমের ভিতরে একা একা বসে, ঘুমিয়ে সারা দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যা পার করে দিলেন। রাত দশটার আগে রাজপোখরা আর ফিরবেন না, সেই অনুযায়ী হিসেব করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে রাত দশটার কিছু পরেই রাজপোখরা ফিরেছিলেন শীতল সরকার। যা আশা করেছিলেন, তাই দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। শীতল সরকারকে অপ্রস্তুত করবার জন্য, উদ্বিগ্ন করবার জন্য, বিপদে ফেলার জন্য সাকচির ডাক্তার হরদয়ালবাবু কোন প্রতিশোধের মূর্তি ধরে ঝাউ-এর ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে নেই। কেউ নেই। ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ, পীড়িত বা ব্যথিত কোন ছায়া পথের উপর ঘুরে বেড়ায় না। অলক্তকের বন্ধ ফটকের মস্তবড় তালাটা দেখতে পেয়ে ওদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতেও কোন অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া, শিবদাস দত্তকেও বলে রাখা হয়েছিল, যদি ওরা রাগ করে কোন অশোভন কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, তবে শিবদাস দত্ত যেন সোজা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কেন আর কিসের জন্য অলক্তকের মন ভয় পেয়ে, ঘৃণা করে আর রাগ করে এই বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছে।

অলক্তকের ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে রাজপোখরার সেই আকাশের দিকে নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়েছিলেন শীতল সরকার, যে আকাশে তখন আর মেঘ ছিল না, বিদ্যুতের চমকও ছিল না। বরং, পরিষ্কার আকাশটা টুকরো চাঁদের আলোতে আরও ঝকঝক করছিল।

শীতল সরকারের চোখদুটো চমকে উঠলো তখন, যখন শিবদাস দত্তের বাঙলোর দিকে চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ছুটে চলে গেল। ওকি! কি ব্যাপার? শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের উপর এত রাত পর্যন্ত আলোর হাসি ঝলমল করে কেন? এত ছায়া ঘোরে কেন? আর, ওরকম শান্ত আর চাপা-চাপা কলরবের মিষ্টি শব্দই বা শোনা যায় কেন?

তাই বিস্মিত হয়ে শিবদাস দত্তের বাঙলোর কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। আর, বারান্দার উপর ডাক্তার হরদয়ালবাবুর হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠেছিলেন, সত্যিই যে উৎসব! শিবদাস দত্তের মেয়ে প্রতিভার সঙ্গে কারও বিয়ে হয়ে গেল? নিশীথের সঙ্গেই কি?

শিবদাস দত্তের ফটকের কাছে আলো-ছায়ার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন শীতল সরকার। এবং, কে জানে কেন, হয় রাগ করে, নয় ভয় পেয়ে অলক্তকের আলোগুলিকে আবার পটপট করে নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সকাল হতেই শীতল সরকারের সেই ভয় একেবারে যেন ধুয়ে মুছে বারান্দার আলপনাটারই মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাঁর মনেও কিছুমাত্র গ্লানি নেই। বাধ্য হয়ে হরদয়াল ডাক্তারের সঙ্গে একটা অভদ্রতা করতে হয়েছে এই মাত্র। উপায় ছিল না। সময়ও ছিল না যে; তা না হলে টেলিগ্রাম করে হরদয়াল ডাক্তারকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিতেন শীতল সরকার, আজ বিয়ে হবে না, চিঠিতে বিস্তারিত জানাবেন পরে।

কিন্তু শিবদাস দত্ত একি কাণ্ড করে বসে রইলেন! ভদ্রলোক বরাবরই একটু, কেমন যেন, ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ। যেমন কথাবার্তায়, তেমনি সাজ-পোশাকে। এবং প্রকৃতিতেও। মনের জোর বলে কোন বস্তুই শিবদাস দত্তের প্রকৃতিতে নেই। কিন্তু নিজের মেয়ের জীবনের শুভাশুভ বিবেচনা করবার শক্তিটুকুও যে নেই, শিবদাস দত্তকে এতটা সন্দেহ করতে পারেননি শীতল সরকার। হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপো নিশীথ রায় নামে যে ছেলের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে দিলেন শিবদাস দত্ত, সেই ছেলের চরিত্রের কথা জানতে পেরেও একটুও কুণ্ঠা, একবিন্দু ভয় দেখা দিল না শিবদাস দত্তের মনে?

শীতল সরকারের সম্পর্কে শিবদাস দত্তের মনে কোন শত্রুভাব

আছে, এমন অভিযোগ শিবদাস দত্তের শত্রুও করবে না। অবশ্য, শিবদাস দত্তের কোন শত্রু আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই, প্রতিবেশী শীতল সরকারের উপর রাগ করে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও একটা গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে শিবদাস দত্ত, এ সন্দেহেরও কোন অর্থ হয় না। শীতল সরকারের উপরে কেন, বোধ হয় এই পৃথিবীর কারও উপর রাগ করে না শিবদাস দত্ত, এবং রাগ করলেও গায়ের জ্বালা ধরে না নিশ্চয় তা ছাড়া, গায়ের জ্বালা থাকলেই বা কি? হরদয়াল ডাক্তারের ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি কারও ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে শিবদাস দত্তের নিজেরই ক্ষতি, বিশেষ করে তাঁর আদরের মেয়ে প্রতিভারই ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি সহ্য করতে গিয়ে শিবদাস দত্তের সারাজীবনের গায়েই যে জ্বালা ধরে যাবে।

সন্দেহ হয়, হরদয়াল ডাক্তারের কথার চালাকিতে মুগ্ধ হয়ে, কিংবা নিশীথেরই সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটা ভাল-মানুষী মায়ায় পড়ে শিবদাস দত্ত এই কাজটা করেছেন। শীতল সরকারকেই অবিশ্বাস করেছেন শিবদাস দত্ত, আর হরদয়াল ডাক্তারকেই বিশ্বাস করেছেন। ভদ্রলোকের মনে এই সন্দেহটুকুও হলো না যে, ভাইপোর চরিত্র সম্বন্ধে আসল খবর জানা থাকলেও হরদয়ালবাবুর পক্ষে সেটা মুখ খুলে বলে ফেলা সম্ভব নয়, বরং দরকার পড়লে মুখ বন্ধ করে সত্য কথাটা চেপেই যাবেন।

শিবদাস দত্তের উপর একটুও ক্ষোভ জাগে না; বরং দুঃখ বোধ করেন শীতল সরকার। ভদ্রলোক তাঁর ঐ ঢিলে-ঢালা স্বভাবের দোষেই এই ভয়ানক ভুল করে বসে রইলেন।

ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে শিবদাস দত্তের ভুলের কথা ভেবে যখন মনে মনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন শীতলবাবু, ঠিক তখন অলক্তকের ফটক পার হয়ে তাঁরই দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসেন, শিবদাস দত্ত।

হ্যাঁ, ঠিকই ধারণা করেছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্ত নিজেই আসবেন। না এসে পারবেন কেন? এতক্ষণ যে আসতে পারেননি, তার একমাত্র কারণ, এতক্ষণ, ভোর থেকে এই এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত মেয়ে-বিদায়ের ব্যাপার নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। অলক্তকের ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পেয়েছিলেন শীতল সরকার, শিবদাস দত্তের ডালিয়াবাগানের কাছে আবার একটা কলরব বাজছে। মোটরগাড়ির ইঞ্জিন গুমরে উঠছে আর হর্ন বাজছে। রাজপোখরার বাতাস থেকে ভোরবেলার এই জাগ্রত উৎসবের হর্ষ ছুটে চলে যেতেই বুঝতে পেরেছিলেন শীতলবাবু, শিবদাস দত্তের নতুন কুটুম হরদয়াল ডাক্তার সদলবলে চলে গেলেন। নীরাজিতা যে বিপদ থেকে বেঁচে গেল, সেই বিপদটাই কী ভয়ানক একটা জেদ করে আর কে জানে কোন কৌশলে শিবদাস দত্তের মেয়েটাকে যেন একটানে লুফে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ঢিলে পায়জামা, গায়ে গেঞ্জি, আর গেঞ্জির উপর চাদর। শিবদাস দত্ত এগিয়ে এসে শীতল সরকারের মুখের দিকে চোখ তুলে কি যেন বলতে গিয়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললেন। প্রতিভাকে ছেড়েই দিলাম, শীতলবাবু।

—ভুল করলেন।

—অ্যাঁ, ভুল? কী ভুল হলো, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, শীতলবাবু।

—প্রতিভার উপর আপনি অন্যায় করলেন।

—কিন্তু···প্রতিভা তো···

—প্রতিভা যদি জানতো যে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, তবে···

—জানে, জানে। আপনার কাছ থেকে শুনে আমিই প্রতিভার কাছে কথাটা বলে ফেলেছিলাম।

শীতলবাবু আশ্চর্য হন। প্রতিভা জেনেও কোন আপত্তি করলো না?

—কই, কোন আপত্তির কথা তো ওর মুখে শুনলাম না।

শীতলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বলেন,—কিন্তু আপনার আপত্তি করা উচিত ছিল।

ত্রুটি স্বীকার করেন শিবদাস দত্ত।—ঠিকই উচিত ছিল; কী আশ্চর্য, কথাটা আমার আর মনেই পড়েনি, শীতলবাবু।

—প্রস্তাবটা কি হরদয়ালবাবুই তুলেছিলেন?

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে বলেন, কই, তাও তো ঠিক মনে পড়ছে না। কে যে কখন প্রস্তাব করলো, আর কার চেষ্টায় বিয়েটা হয়ে গেল, আমি ঠিক এখনও ধরতে পারছি না, শীতলবাবু।

—তা হলে অনুমান করছি, নিশীথ আর প্রতিভা দু'জনে নিজেরাই ইচ্ছে করে…

—হতে পারে। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, ওঁরা একটু চা-পর্যন্ত না খেয়ে রাজপোখরা থেকে ফিরে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে আমার বড় খারাপ লেগেছিল। তাই, বাধ্য হয়ে, চা খেতে নেমন্তন্ন করে ফেললাম। আর, তার পরিণাম এই হলো যে, মেয়েটার বিয়েই হয়ে গেল।

চাদর দিয়ে ভেজা-চোখ ঘষে আবার ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে রাজপোখরার সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবদাস দত্ত। ঝাউ-এর ছায়ার সারি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে সড়কটা খোলা ডাঙার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেন ছায়ানীল দিগন্তের পায়ের কাছে গিয়ে মুছে গিয়েছে। শিবদাস দত্ত প্রশ্ন করেন, হরদয়ালবাবুর ভাইপো নিশীথ কোথায় যেন কাজ করে, জায়গাটার নামটা বলতে পারেন, শীতলবাবু?

করুণভাবে হাসতে থাকেন শীতল সরকার, সে-সব খবর আমি জানি। সবই আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। জায়গাটা খুব দূরদেশের কোন জায়গা নয়। আর নিশীথের চাকরিটাও খারাপ নয়। নিশীথের বিদ্যেবুদ্ধিও যথেষ্ট। সে-সব নিয়ে ভাবনা করবার

কিছু নেই। প্রশ্ন হলো, ঐ একটি প্রশ্ন, যেটা ভাবতে গিয়ে আপনার জন্য দুঃখ বোধ করতে হচ্ছে।

শিবদাস দত্ত আবার শীতল সরকারকে আশ্চর্য করে দেন।—দুঃখ? দুঃখ বোধ করছেন কেন? আমি তো, বলতে গেলে, কান্নাকাটি করেও বেশ ভালই বোধ করছি, শীতলবাবু।

—নিশীথের চরিত্র যদি ভাল হতো, তবে আর কিছু বলবার ছিল না। দুঃখ বোধ করতাম না।

—ও হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু…কথাটা কি জানেন. চরিত্র বলতে আমি স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। এটাই বোধ হয় আমার চরিত্রের ভয়ানক একটা…

শীতলবাবু হাসেন, তা না হলে আর এই ভুল করবেন কেন?

—নিশীথ কি খুব রাগী স্বভাবের মানুষ?

—সে খবর রাখি না। মোট কথা…

—মিথ্যে কথা-টথা বলবার অভ্যাস আছে বোধহয়।

—আরে না মশাই, ওসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয়না।

—তাহলে, সন্দেহ করতে হয় যে…

—সন্দেহ নয়, প্রমাণ আছে আর সাক্ষী আছে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয়, এক মহিলার সঙ্গে নিশীথের ঘনিষ্ঠতা আছে।

—আমারও সম্প্রতি এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

—তার মানে? কার সঙ্গে?

—মিসেস ফস্টারের সঙ্গে। চমৎকার মানুষ। ক'দিনেরই বা পরিচয়, তাতে আবার বিদেশী মানুষ, কিন্তু আলাপ করলে একেবারে ঘরের মানুষের মতো মনে হয়।

শীতলবাবু হাসেন, আপনার দোষ এই যে, আপনি পৃথিবীর সবাইকে আপনারই মতো ভালমানুষ ভাবেন।

—ঠিক কথা, শীতলবাবু। নিশীথকে দেখে মনে হলো, ছেলেটি আমার চেয়েও ভালমানুষ।

—মোটেই নয়।

বিরক্ত হয়ে একবার ঘরের ভিতরে টেবিলটার দিকে তাকান শীতলবাবু। টেবিলের উপর সেই চিঠি এখনও পড়ে আছে, যে চিঠিটা কাল সকালে শীতল সরকারের হাতে পৌঁছেছিল, এবং যে চিঠির বক্তব্য পড়েই আতঙ্কিত হয়ে, নীরাজিতার অদৃষ্টের বিপদ বুঝতে পেরে, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সাবধান হতে পেরেছেন শীতলবাবু। ঐ চিঠিটাই নীরাজিতার জীবনটাকে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নীরাজিতা নিজেও ঐ চিঠি বার বার তিনবার পড়েছে। তার পর, মনে পড়ে শীতলবাবুর, নীরাজিতা নিজেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমি এখনি কলকাতা চলে যাব।

চিঠিটা যেন ছোট একটা ইতিহাসের বৃত্তান্ত। আটপৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট। ঐ চিঠির একটা পাতা পড়লেই শিবদাস দত্তের মোহ ভেঙে যাবে, এবং বুঝতে পারবেন যে, ভালমানুষী খেয়ালের ভুলে মেয়েকে তিনি কোন সর্বনাশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠিক কথা, চিঠিটা নিশীথ রায়ের চরিত্রের গল্প বলতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছে, তার কোনটাই অবিশ্বাস করবার কারণ নেই। চিঠিটা যে লিখেছে, তার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন কারণ নেই, তার নিজের কোন স্বার্থের অভিসন্ধিও নেই। শুধু সত্যের খাতিরে, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের জীবনকে একটা বিপদ থেকে সাবধান করে দেবার জন্য এই চিঠি এসেছে। এখনও ভেবে দেখতে পারেন, নিশীথ রায়ের মতো মানুষের কাছে মেয়েকে সঁপে দেবেন কিনা। আপনাদের কোন দোষ নেই, আপনার মেয়েরও কোন ভুল হয়নি। সব না জেনে, আপনাদের শুধু বিশ্বাস করবার ভুলেই এই বিয়ে হতে চলেছে। কিন্তু গালুডির ধীরেন যে আপনাদেরই আত্মীয়। আপনারা কি জানেন না, সে কী প্রকৃতির মানুষ? আর, তার স্ত্রী সুনয়না কোন প্রকৃতির মেয়েমানুষ?

দোষ শুধু নিশীথের একার নয়। দোষ তিনজনের। ধীরেনের

দোষ, সুনয়নার দোষ আর নিশীথের দোষ। সুনয়নার সঙ্গে নিশীথের যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তারপর নিশীথের পক্ষে বিয়ে করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না করাই উচিত ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব জেনে শুনেও, কেন যে নিশীথ আর এক নারীর জীবনকে একটা সমস্যার মধ্যে টেনে আনবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছি না।

নিশীথের সাধ্য নেই, সুনয়নার ছায়া থেকে সে সরে যেতে পারে। কারণ সুনয়নাই তাকে সরে যেতে দেবে না। লজ্জার কথা, আপনার আত্মীয় ধীরেনই নিশীথকে সুনয়নার গ্রাস থেকে মুক্তি দেবে না। আপনি জানেন, ধীরেন কী বস্তু!

ধীরেন, সুনয়নার যে দশা করেছে, তাতে সুনয়নার পক্ষেও নিশীথের অমন দশা করে তোলাই স্বাভাবিক। আর নিশীথের পক্ষেও অমন দশা মেনে নিয়ে পড়ে থাকাই উচিত, বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়।

জানেন না নিশ্চয়, আগে নিশীথই গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার মুখের হাসি দেখে মুগ্ধ হতো ; সুনয়নার জীবনের অভিমান ভাঙিয়ে, আর সুনয়নাকে ভালবাসার সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে যেত। আজকাল অধঃপতনের রকমটা আরও ভয়ানক হয়ে আরও গভীরে নেমে গিয়েছে। নিশীথ আজকাল গালুডিতে যায় না, সুনয়নাই কালিকা-পুরে আসে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, নিশীথের কালিকাপুরের কোয়ার্টারে কতদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুনয়নাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কালিকা মাইনস্-এর কুলী কেরানী থেকে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত সকলেই জানে, সুনয়নার চোখের সামনে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে নিশীথ।

আমি জানি, সুনয়না নিজের থেকে চলে না গেলে, সুনয়নাকে চলে যেতে অনুরোধ করবার সাহস পর্যন্ত নিশীথের কোনদিন হয়নি। সুনয়না বললেই, শত কাজ থাকলেও, পাহাড়ের ধারে একবার বেড়িয়ে না এসে পারে না নিশীথ, নিশীথের মনে শত দুর্ভাবনা

থাকলেই বা কি? সুনয়না দাবি করলেই, কালিকাপুরের সেই ছোট পুকুরটা, সেই রূপসাগরের এক কোণে ঘাসের উপর বসে আর বুনোফুলের উপর রঙীন ফড়িং-এর খেলা দেখতে দেখতে সুনয়নার সঙ্গে গল্প করতে হয়। একদিন জ্বর হয়েছিল নিশীথের; আমিই খবর পেয়ে নিশীথকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিশীথের ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি, নিশীথের শিয়রের কাছে বসে আছে সুনয়না। আমাকেই সাবধান করে দিল, ঘরে ঢুকবেন না, নিশীথবাবুর জলবসন্ত হয়েছে।

তবে আর বাকী রইল কি? নিশীথের বিয়ে করবার দরকারটাই বা কি? পরনারীর মোহ মায়া লোভ আর সেবা নিয়ে এত জড়িয়ে পড়েছে যার জীবন, সে মানুষ আপনার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন? জানি না, আপনার মেয়ে নিশীথকে চেনে কিনা। চিনে থাকলেও, কতটুকু চিনেছে জানি না। এবং যেটুকু চিনেছে, সেটুকু ভুল চেনা চিনেছে।

আমি পড়েছি সে সব চিঠি; সুনয়না যে সব চিঠি নিশীথকে লিখেছে। সে-সব চিঠির ভাষা আর কথা এখানে উল্লেখ করে আপনাকে আর বেশী আতঙ্কিত করতে চাই না, যেটুকু জানিয়েছি, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। হ্যাঁ, এইটুকু শুধু না বলে পারছি না; নিশীথ বিয়ে করে, এটা সুনয়নার একটুও পছন্দ নয়। সুনয়নার আপত্তি শুধু আপত্তি নয়, সে আপত্তি একটা উন্মাদের রাগ। যদি বিয়ে করে নিশীথ তবে নিশীথের স্ত্রী নামে সেই দুর্ভাগিনীকে চিরকালের মতো সরিয়ে দেবে সুনয়না, নয় নিজে চিরকালের মতো সরে যাবে। এই অবস্থায়, বুঝে দেখুন···

চিঠিটা বাতাস লেগে ফরফর করছে; শীতলবাবু যেন তখনো চিঠিটার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছেন, এবং শিউরে উঠছে তাঁর চোখ-মুখ। যাক, ভাগ্য ভাল, নীরাজিতা এখন নিরাপদ। এতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে নীরাজিতা। কিন্তু, শিবদাস দত্তের

মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শীতল সরকারের চোখদুটো এইবার ছলছল করে ওঠে। এবং ক্ষুব্ধস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতলবাবু, আপনার ওপর এবার আমার সত্যিই রাগ হচ্ছে, শিবদাসবাবু।

—আমার ত্রুটি যদি কিছু হয়ে থকে, তবে অবশ্যই···

—ত্রুটি? আপনি প্রতিভার জীবনটাকেই নষ্ট করলেন।

শিবদাসবাবুর দুই লাল চোখ আরও ব্যথিত হয়ে থরথর করে। —বুঝলাম না, শীতলবাবু।

—নিশীথ অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত।' এবং সেই নারীও নিশীথের প্রতি আসক্ত। সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, সেই নারী একটি ভয়ানক স্বভাবের মানুষ। আপনার মেয়ের প্রাণটাই নিরাপদ থাকবে কিনা সন্দেহ।

শীতল সরকারের দুই হাত জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন শিবদাস দত্ত। অসম্ভব বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি মিছামিছি ভয়ানক একটা সন্দেহের কথা বলছেন, শীতলবাবু।

শীতলবাবু বলেন, আপনি কি বলতে পারেন, আপনাকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে আমার কোন লাভ আছে?

—না না; যত ভুল কথাই বলিনা কেন, আপনাকে ও-কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একটা মিথ্যে গল্প শুনেছেন।

—না। মিথ্যে নয়, গল্পও নয়। যার কাছ থেকে এসব খবর পেয়েছি, সে যদি মিথ্যেবাদী হয়, তবে এ সংসারে সত্যবাদী কেউ নেই। যে লিখেছে, তাকে আমি তিনপুরুষ ধরে চিনি। তার ঠাকুরদাকে চিনতাম, তার বাবা আমার দাদার বন্ধু, আর তাকেও চিনি। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের ম্যানেজার মিস্টার স্টোকার নিজের মুখে আমাকে বলেছেন, বিভূতি হলো আয়রন-ম্যান। অর্থাৎ···

শিবদাস দত্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, এবং শীতল সরকার বিরক্ত

হয়ে বলেন, এখনও যদি স্পষ্ট করে না বুঝে থাকেন, তবে আমি আমার নিজেরই জানা একটা ঘটনার কথা বলি।

—বলুন।

—মিস্টার স্টোকারের একটি যুবতী ভাইঝি ঐ বিভূতির কাছ থেকে চমৎকার একটি ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া ছেড়েই চলে গিয়েছে।

—কেন ?

—বিভূতির চরিত্র লোহার চেয়েও শক্ত। সুন্দরী মিস স্টোকারেরও সাধ্য হয়নি যে, বিভূতিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলে।

শিবদাস দত্তের চোখে ছোট একটা ভ্রূভঙ্গী শিথিল হয়ে যেন হাসতে থাকে। তাহলে বলুন, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, নিশীথের চরিত্র ভাল নয় ?

—বললাম যে, নিশীথের চরিত্রের একটা ইতিহাস লিখে জানিয়েছে।

শিবদাস দত্তের লাল চোখের ছলছল করুণতা আর নিশ্বাসের উদ্বেগ যেন সেই মুহূর্তে হো-হো করে হেসে মরে যায়। শীতল সরকারের হাত ছেড়ে দিয়ে যেন দুর্বার এক খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন শিবদাসবাবু।

শীতল সরকার ভ্রূকুটি করেন, আপনি কি সবই অবিশ্বাস করলেন ?

—খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি চিঠি দিয়েছে আপনাকে। তাই বলুন। বিশ্বাস করতেই হাসি পাচ্ছে, শীতলবাবু।

কলকাতার রেসের মরশুম পড়তেই গালুডিতে আর একটা দিনও থাকে না যে ধীরেন বোস, তারই স্ত্রী সুনয়না যেন গালুডির আলো ছায়ার মধ্যে নিজের জীবনটাকে সঁপে দিয়ে বসে আছে। কলকাতায় যাবার জন্য সুনয়নার মনে কোন ব্যাকুলতা নেই ; যদিও সুনয়নার মা আজ বেঁচে আছেন, এবং প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে চিঠি লেখেন : অন্তত এবার পূজার সময় কলকাতায় এসে একটা মাস আমার সঙ্গে থেকে তারপর চলে যাস, সুনি ; এমন কিছু সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে তো থাকিস না। গালুডি থেকে এবেলা রওনা হলে ওবেলায় কলকাতাতে পৌঁছতে পারা যায়। তবে কেন ? কিসের অসুবিধা ? বাধাই বা কিসের ? ধীরেনের যদি সময় না হয়, তবে তুই তো একলাই চলে আসতে পারিস।

সুনয়নার জীবনের উপর মায়া করবার মত একজনই মানুষ আছেন। তিনি হলেন সুনয়নার মা ; আর যাঁরা আছেন, তাঁরা আপনজনের মত। সুনয়নার জেঠতুতো দাদা পরেশ আছেন, যিনি সুনয়নার লেখাপড়ার খরচ থেকে শুরু করে বিয়ে দেবার খরচ পর্যন্ত সব দায় স্বীকার করে খুড়তুতো বোনের জীবনের উপর অনেক দয়া করেছেন। আজও সুনয়নার মা, পরেশেরই কলকাতার বাড়িতে আছেন। বিধবা খুড়িমাকে দয়া করলেও শ্রদ্ধা করেন পরেশদা। আজও সুনয়না ইচ্ছে করলে পরেশদার বাড়িতে এসে একটা বছর থাকতে পারে ; এবং থাকলে বাড়ির কোন মানুষ একটুও বিরক্ত না হয়ে বরং খুশিই হবে। কিন্তু কলকাতায় আসবার জন্য সুনয়নার মনে কোন ইচ্ছা আছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হয়েছেন পরেশদা। তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে সুনয়নার ; বিয়েতে আট-দশ হাজার খরচ করে ফেলতেও একটুও কুণ্ঠিত হননি পরেশদা। যে মেয়ের

জীবনের উপকার করতে গিয়ে এতটা করলেন পরেশদা, সেই মেয়ে এই তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় আসবার নামও করলো না। মনে মনে বেশ ক্ষুণ্নও হয়েছেন পরেশদা। মানুষও এমন করে উপকার ভুলে যায়; এত অকৃতজ্ঞ হয়! কাকা বেঁচে থাকলে, কিংবা সুনয়নার কোন আপন দাদা থাকলে, সুনয়নার জন্য এর চেয়ে বেশি কি আর করতেন? বিয়ের পর পরেশদাকেই সব চেয়ে বেশি পর বলে মনে করে ফেললো সুনয়না, কী দুঃখের কথা!

পরেশদা কল্পনাও করতে পারেন না, কেন সুনয়নার মন কিসের বিভ্রমে এত কঠোর হয়ে গেল? ধারণা করতে পারেন না পরেশদা, তিনি নিজেই ভুল করে একটা ভুল সন্দেহ নিয়ে সুনয়নার জীবনের একটা কঠোর অভিমানকেই অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করেছেন। এবং সুনয়না জানে, আর কলকাতায় গিয়ে মার কাছে কিংবা পরেশদার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কোন অর্থ হয় না। সুনয়নার মুখে হাসি দেখলেও ওঁরা কিছু বুঝতে পারবেন না: চোখে জল দেখলেও না।

এই গালুডির আলো ছায়া থেকে সরে গিয়ে পৃথিবীর কোন জনতার চোখের সামনে গিয়ে মুখ দেখাতে যেন ভয় করে সুনয়নার। দরকার নেই। গালুডির এই ছোট বাঙলো-বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে শুধু আয়নার কাছে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই হলো। এই আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারে সুনয়না। কেন হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, কেন ঠোঁটের উপর অদ্ভুত হাসি সিরসির করে ওঠে, আর কেনই বা একটা রুক্ষ ভ্রূকুটি মাঝে মাঝে চোখ দুটোর উপর ছটফট করে, সবই বুঝতে পারে সুনয়না। কখনো নিজের এই জীবনের উপর প্রবল মায়া, কখনো নির্মম ঘৃণা এবং কখনো বা একটা উল্লাস সুনয়নার চোখ মুখ আর ঠোঁটের উপর খেলা করতে থাকে।

পরেশদার দোষ নেই। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে, সুনয়নার জীবনে একটা উৎসবের আনন্দ এনে দিতে গিয়ে, আট-দশ হাজার

টাকা খরচ করে কি ভয়ানক অভিশাপের মধ্যে সুনয়নাকে ঠেলে দিয়েছেন পরেশদা! গালুডি স্টেশন পার হয়ে, লাইন ধরে আধ মাইলের বেশি যেতে হয় না, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যে সুন্দর চেহারার বাঙলো-বাড়িটা, সেই বাড়িটাকে দেখেই কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পরেশদা? বাড়ির ফটকের দুপাশে দুসারি দেওদার; ছায়াটা যেমন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি বাঙলো-বাড়ির চারদিকের যত লতার ফুলের রূপ আর গন্ধ। এ-হেন মিষ্টি চেহারার বাড়ির মানুষটার চেহারাও তো কম মিষ্টি নয়। ধীরেন বোসকে দেখলে সবার আগে সবারই মনে এই সন্দেহ দেখা দেবে যে, মানুষটি হয় কবি, নয় দার্শনিক। এমন চমৎকার একটি জায়গাতে, এমন সুন্দর একটি বাঙলো-বাড়ি তৈরী করে নিয়ে যিনি জীবনের নীড় গড়ে নিয়েছেন, তাঁর মনের রুচি আর শখের প্রকৃতি সহজেই বুঝে ফেলতে পারা যায়। তা ছাড়া, পরেশদা নিজে এসে নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন, কী চমৎকার কারবার করে ধীরেন বোস। কারবারের বাৎসরিক প্রফিটের হিসাব পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলেন পরেশদা। ঘাটশিলা, চাইবাসা আর গোলমুড়িতে স্টোন-চিপ ও লাইম-ঘুটিং সাপ্লাই করে ধীরেন বোস। গালুডি থেকে চার মাইল দূরে একশো বিঘা জায়গা জুড়ে ধীরেন বোসের ইজারা কোয়ারি। একশো মজুর কাজ করে; আর, চারটি ট্রাক দিবারাত্রি ছুটোছুটি করে। সে ধীরেন বোসের সঙ্গে সুনয়নার বিয়ে দেওয়া, সৌভাগ্যের অনুগ্রহ বলে মনে করেছিলেন পরেশদা। অস্বীকার করে না সুনয়না, সুনয়নাও যে বিয়ের আগে একদিন, কলকাতার বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের ছবি দেখতে দেখতে বুকের ভিতরে একটা নিবিড় নিঃশ্বাসের বিস্ময় সামলে রাখবার চেষ্টা করেছিল; সত্যিই তো, ধীরেন বোসের মত মানুষ সুনয়নাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এর মধ্যে সৌভাগ্যের অনুগ্রহ ছাড়া আর কি রহস্য থাকতে পারে?

পরেশদা কি ধীরেন বোসকে চিনতে আর বুঝতে ভুল করেছিলেন? না, একটুও ভুল করেননি। ধীরেন বোস তার জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি কথাও বাড়িয়ে বলেনি, এবং মিথ্যেও বলেনি। বিয়ের পর গালুডির এই বাড়িতে এসে, দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেন জীবনের এক সফল স্বপ্নের আনন্দে স্নিগ্ধ হয়ে সুনয়না নিজেও বুঝতে পেরেছিল, গালুডির এই নিরালা বাঙলো-বাড়ির সুখের মধ্যে কোন ভেজাল নেই, মিথ্যে নেই। ধীরেন বোস ভালবাসতে জানে, ভাল কথা বলতে জানে, আর কাজ-কারবার নিয়ে খাটতেও জানে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এ-হেন ধীরেন বোস একদিন, বিয়ের পর মাত্র দুটো মাস পার হয়েছে সেই দিন, সুনয়নারই হাত ধরে রেল-লাইনের পাশে বেড়াতে বেড়াতে যে কথা বললো, সে-কথা একেবারে নতুন রকমের একটা জীবনের ইচ্ছার কথা। এই মাটি-বেচা জীবন আর ভাল লাগে না, সুনয়না।

আশ্চর্য হয়েছিল সুনয়না—তার মানে?

—বড় বেশি পরিশ্রম। দিনরাত মজুরদের পিছনে লেগে থাক; মাসে দশবার এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি কর; টেণ্ডার নিয়ে সাধাসাধি কর; বিল আদায় করতে হিমসিম খাও; তবে গিয়ে বড় জোর হাজার-দুহাজার টাকা মাসে রোজগার করা যায়। এ অবস্থায় চললে টাকার মুখ আর কখনো দেখতে হবে না।

—এর চেয়েও বেশি টাকা রোজগার করার দরকার কি?

ধীরেন বোস হাসে, তুমি বোধ হয় প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং ভালবাস।

সুনয়নাও হাসে, ওসব তত্ত্বকথা বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি যে যেমনটি আছি, তেমনটি থাকতে পারলেই ভাগ্যির কথা।

—না সুনয়না। এতে সুখী হওয়া যাবে না।

—সুখী হয়েই তো আছি।

—তুমি বুঝবে না, সুনয়না।

—বুঝিয়ে দাও।

ধীরেন বলে, আমি বরং বলবো যে, হাই লিভিং আর প্লেন থিংকিং হলো আসল সুখের জীবন।

সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে রেল লাইনের পাশে পাশে স্বামীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই প্রথম চমকে ওঠে সুনয়না। ধীরেন বোসের কথাগুলিকে একটু বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে; তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ধীরেন বোসের গলার স্বর। ধীরেন বোসের মুখের ঐ তত্ত্বকথার মত ধীরেনের গলার স্বরটাও যেন কেমন এলোমেলো; এবং ধীরেনের নিঃশ্বাসের বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধও যেন টলমল করছে।

ধীরেনের মুখটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে সুনয়না। ধীরেন বলে, এখনও বুঝতে পারলে না সুনয়না?

—না।

সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন—আমি ভালরকম পয়সা করতে চাই সুনয়না। মাসে দু-এক হাজার নয়, দু-এক লাখ হলে তবে খুশি হতে পারি।

—আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—একটা পরামর্শের কাজে গিয়েছিলাম।

—কি খেয়ে এসেছ?

ধীরেন হাসে, যা খেয়েছি, সেটা খাওয়া কি দোষের?

—না, দোষের নয়। কিন্তু আমার সামনে খেলেই তো পার।

—তুমি কিছু মনে করবে না?

—আমার সামনে খেলে একটুও আপত্তি করবো না। কিন্তু…

—কি?

—তুমি আবোল-তাবোল কথা বলতে পারবে না।

—তার মানে?

—এই যে, এখন যে-সব কথা বলছো। দু-এক লাখ টাকার কথা, বড়লোক হবার কথা!

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধীরেন, এটা যে আমার স্বপ্নের কথা, সুনয়না। আমাকে বড়লোক হতেই হবে। মাটি-বেচা এই সামান্য টাকার রোজগারে আমি সুখী হব না, তুমিও সুখী হতে পারবে না।

সেইদিনই কলকাতার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল সুনয়না। আমি এখন কলকাতায় যেতে পারবো না, মা। কবে যেতে পারবো, তাও বলতে পারছি না।

গালুডির এই তিন বছরের জীবনের মধ্যে শেষ দুটো বছরের জীবনটাই সুনয়নার জীবনের একটা মোহ। অতি অদ্ভুত ও অতি নির্মম একটা মোহ। সেই মোহ দুবছর ধরে সুনয়নার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি, বিচিত্র জ্বালা আর অদ্ভুত উল্লাসের শিহর জাগিয়ে সুনয়নার জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে। কালিকা মাইনস্-এর নিশীথ রায় হলো সুনয়নার জীবনের নতুন মোহ।

মনে পড়ে সুনয়নার, যেদিন নিশীথ রায়কে এই বাড়িতে চা খেতে ডেকেছিল ধীরেন, এবং নিশীথও যেন সেই চা খেতে এসে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিন নিশীথ রায়কে একটা নতুন অভিশাপের আবির্ভাব বলে মনে হয়েছিল সুনয়নার। নিশীথের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি সুনয়না; কিন্তু নিশীথ রায় সেজন্য নিজেকে একটুও অপমানিত বোধ না করে ধীরেন বোসের হাতে দুহাজার টাকার একটা চেক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—কিসের চেক? জিজ্ঞাসা করেছিল সুনয়না।

শেয়ার কেনা-বেচা করবো, সেইজন্যে নিশীথ রায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিলাম।

হ্যাঁ, ধীরেন বোস তার নতুন ইচ্ছার নেশা আর অহংকারে মাটি-বেচা কারবার অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর, রেসের মরশুমে রেস, এবং শেয়ার মার্কেট। মাসের বিশটা দিন

কলকাতাতেই পার করে দেয় ধীরেন। গালুডিতে যখন ফিরে আসে, তখন দু-চারটে হুইস্কির বোতল ছাড়া আর কোন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসে না। সেই হুইস্কি ফুরোয়; এবং আবার কলকাতার রেসের কিংবা শেয়ার মার্কেটের আহ্বান এসে ধীরেন বোসের আশা আর কল্পনা উতলা করে দেয়। আবার কলকাতা যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে ধীরেন বোস। আবার টাকা চাই। কিন্তু কোথায় টাকা?

—তুমি যদি নিশীথ রায়কে নিজের মুখে বল, তবে কিছু বেশি টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে।

নেশার আবেশে ছল-ছল দুটো লাল চোখের অলস দৃষ্টি তুলে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন আবেদন করেছিল ধীরেন। আর, সুনয়নার দুচোখে যেন দুটো আগুনের জ্বালা দপদপ করে উঠেছিল।

কিন্তু সুনয়নার চোখের সেই চাহনিকে যেন প্রচণ্ড একটা অবহেলার কঠোর হাসি দিয়ে তুচ্ছ করে চেঁচিয়ে ওঠে ধীরেন, গালুডির টিম্বারমার্চেন্ট রামগোপাল চৌহানকে চেন?

—না।

—রেলওয়েতে শ্লিপার সাপ্লাই করে, কন্‌ট্রাক্টর রামগোপাল চৌহান, আমার বন্ধু।

—বুঝলাম।

—রামগোপালকে বলা আছে, কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য যখনই তোমার গাড়ির দরকার হবে, তখনই পাঠিয়ে দেবে।

—আমার গাড়ির দরকার নেই।

ধীরেন উঠে দাঁড়ায়, দরকার আছে। তোমাকে আজই একবার কালিকাপুর যেতে হবে।

—কেন?

—নিশীথকে গিয়ে বলতে হবে, অন্তত তিনটে হাজার টাকা আমার খুব দরকার।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, ভ্রুকুটি করে চোখের চাহনি প্রায় হিংস্র করে নিয়ে সুনয়না বলে, আর একবার ভেবে নিয়ে বল।

—কিছুছু ভাববার নেই। আমার ওসব ভাববার গরজ নেই।

—নিশীথ রায়ের কাছে গিয়ে আমি টাকা চাইলে নিশীথ রায় যদি আমাকে অপমান করে?

ধীরেন হো হো করে হেসে ওঠে, অপমান? নিশীথ রায় তোমাকে অপমান করবে? ছিঃ, তোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নিশীথ রায়।

সুনয়না সেদিন যেন নিজের অদৃষ্টটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য একটা আক্রোশ নিয়ে কালিকাপুর মাইন্‌স-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। টাকার জোরে পরস্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকাবার আনন্দ পেতে চায়, সে মানুষকেও এইরকম ভ্রুকুটি দিয়ে ঘৃণা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সুনয়না।

কিন্তু সুনয়নারই অদৃষ্টের পরিহাস। ঘৃণা করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। সুনয়নার কথা শুনে কি ভয়ানক চমকে উঠলো নিশীথ রায়। ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো নিশীথের চোখ দুটো।

—আপনি কেন এসেছেন? সামান্য টাকার জন্য আপনি এতটা পথ কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছেন, ছিঃ। একটা চিঠি দিলে আমিই তো গালুডিতে গিয়ে, ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে···

নিশীথের গলার সেই ভয়াতুর ভাষার শব্দ শুনে নিশীথের ভীরু চেহারার দিকে সুনয়না হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

প্রশ্ন করে সুনয়না, আমার এখানে আসা কি অন্যায় হয়েছে?

—নিশ্চয়। ধীরেনবাবু শেয়ারের কারবার করেন, তাঁর টাকার দরকার পড়েছে; কিন্তু সেজন্য আপনি টাকার যোগাড়ে ছুটোছুটি করবেন কেন?

—তাহলে আমি চলে যাই।

—নিশ্চয়। আমি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবো, যদি অবশ্য টাকার যোগাড় করতে পারি।

—আপনি টাকা দেবেন কেন?

সুনয়নার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নিশীথের মুখের চেহারা এইবার করুণ হয়ে যায়। ঠিকই বলেছেন। আর টাকা দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু…

—কি?

—কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আর টাকা দেওয়া উচিত নয়; তবে আমি দেব না।

—সেটা আপনি ভেবে দেখুন।

—আপনি যদি আমাকে মিছিমিছি কোন সন্দেহ না করেন, তবে এবারের মত টাকা দিতে পারি।

—কিসের সন্দেহ?

নিশীথ হঠাৎ নিরুত্তর হয়ে যায়।

সুনয়না বলে, না, কোন সন্দেহ করছি না।

—শুনে সুখী হলাম।

নিশীথ হেসে ফেলে, ভয় ভেঙে গেল। আপনি আমাকে ভুল বোঝেননি।

চলে যায় সুনয়না; এবং পরদিনই নিজে গালুডিতে এসে ধীরেনের হাতে তিন হাজার টাকার একটা চেক ধরিয়ে দেয় নিশীথ। তারপর, আর পনেরোটা মিনিটও দেরি করেনি ধীরেন। চেক হাতে নিয়ে যেন একটা দুরন্ত স্বপ্নের নেশায় আকুল হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনের দিকে ছুটে চলে যায়।

আর, সুনয়নার দুচোখ থেকে ঝরঝর করে একটি নীরব কান্নার বেদনা জল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

—এ কি করছেন? চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ।

—আপনি কি ভয়ানক ভুল করলেন, বুঝতে পারছেন? আস্তে আস্তে বলে সুনয়না।

—না।

—ধীরেন বোসের স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় স্বীকার করে নিলেন।

—না, কখ্‌খনো না; হতে পারে না। আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—আপনি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। আমার দোষ নেবেন না।

—কিসের বিপদ?

—এই যে এত রাত হয়ে গিয়েছে; অথচ আপনি এখানে আমার সামনে একা বসে আছেন। গালুডিতে ফিরে যাবার এখন যে আর কোন গাড়ি নেই।

—তাতে কি হয়েছে? আমি এখনি গিয়ে স্টেশনে বসে থাকবো।

—কিন্তু আমি যেতে দেব না।

সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন প্রতিবাদের ভাষা ফিসফিস করেও উচ্চারণ করতে পারেনি নিশীথ। কী অদ্ভুত রকমের একটা আক্রোশ নিয়ে জ্বলজ্বল করছে সুনয়নার চোখ দুটো। সেই সঙ্গে সুন্দর গড়নের ঠোঁট দুটো কী নিবিড় আবেশে গোলাপের পাপড়ির মত ফুলে উঠেছে।

নিশীথ বলে, আমাকে যেতে দিন।

—না।

—কেন?

—আপনার যাবার ইচ্ছা নেই।

—কে বললে?

—আপনি নিজের মনকে জিজ্ঞেসা করুন।

যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে নিশীথের মুখটা। কী ভয়ঙ্কর

সত্য কথা বলে দিয়েছে সুনয়না! সুনয়নার এই জ্বলজ্বল চোখের দৃষ্টি যেন নিশীথের বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস আর শোণিতের সব ক্রন্দনের খেলা একেবারে স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছে।

না, সে রাতে কালিকাপুর ফিরে যেতে পারেনি নিশীথ। সকাল হতে যখন এই বাঙলো-বাড়ির দেওদারের ছায়া পার হয়ে হনহন করে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে গেল নিশীথ, তখন শুধু মনে হয়েছিল, হঠাৎ আত্মহত্যা করবার পর নিশীথ রায়ের একটা রক্তমাংসহীন প্রেতচ্ছায়া ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সুনয়নার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি নিশীথ। আর, সুনয়না শুধু অপলক চোখ তুলে নিশীথ রায়ের সেই পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে এই দেওদারের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিশীথ রায়কে ভালবাসে সুনয়না, এ কথা কারও মুখে শুনতে পেলে সুনয়না আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলবে। পৃথিবীর কোন মানুষকে ভালবাসতে পারে সুনয়না, এই কথাটা সুনয়নারই কাছে আজ সব চেয়ে বেশি অবিশ্বাসের কথা হয়ে গিয়েছে। নিশীথ রায়কে ভালবাসার কথা কোনদিন মনেও হয়নি সুনয়নার। শ্রদ্ধা? সে তো আরও অসম্ভব। মায়া? তাই বা বলা যায় কি করে? জলবসন্ত হয়ে একলা ঘরে খাটের উপর শুয়ে একদিন ছটফট করেছিল নিশীথ এবং সেই নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছিল সুনয়না। কিন্তু জানে সুনয়না, সে মায়া নিশীথ নামে একটা মানুষের জন্য মায়া নয়। নিজেরই একটা স্বার্থকে, সুনয়নার একটা ইচ্ছার সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে ছিল সুনয়না।

এক বুক জলে ডুবে যাবার পর আরও গভীরে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, এমন আক্রোশ কোন মানুষের জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু সুনয়নার জীবনে সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। ডুবলে একেবারে জলের গভীরে ডুবে যাওয়াই ভাল। হাঁটুজলে নাকানি-চুবানি খাওয়া আরও দুঃসহ ব্যাপার। নিশীথ রায়কে যেন এই

ডুবন্ত জীবনের চিরসাথী করবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে সুনয়নার জীবন একটা উল্লাসের বিকার বরণ করে নিয়েছে। নিশীথ রায় সুনয়নাকে ভয় পায়, কিন্তু নিশীথকে ভয় পাইয়ে সুখী হওয়াই যেন সুনয়নার জীবনের সাধ। সুনয়নার দিকে মাঝে মাঝে যেভাবে তাকায় নিশীথ, তার মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কোন ভাবের ছায়াও থাকে না। কিন্তু সুনয়নার বুকের ভিতরে যেন একটা অট্টহাসির শব্দ বেজে ওঠে, দেখি, কত ঘৃণা করতে পারে।

টাকা চায় না সুনয়না; কিন্তু নিশীথ রায় টাকা দেয়। কোনদিনও আপত্তি করে না সুনয়না। টাকা নিতে লজ্জাও নেই বোধ হয়। বরং নিশীথ রায়ের শরীরটার মত নিশীথ রায়ের টাকাকেও যেন নিজের ইচ্ছামত খেলা করবার বস্তু বলে মনে করে ফেলেছে সুনয়না। ধীরেন বোস নামে একটা মানুষ, যাকে ইহজগতের সব মানুষ আজও সুনয়নার স্বামী বলে জানে, সে মানুষ ইচ্ছে করেই সুনয়নার জীবনকে একলা করে দিয়ে রেস, শেয়ার আর হুইস্কির জগতে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারেনি সুনয়না; পাগল হয়ে যেতেও পারেনি। তাই বেঁচে থাকবার জন্য নিশীথ রায়ের টাকা আর নিশীথ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই সত্য বুঝতে পারে নিশীথ, এবং এই সত্য স্বীকার করে সুনয়নার মন। নারী ও পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে পঙ্কিল সম্পর্ক আর কি হতে পারে?

সুনয়না জানে, হাঁপ ছাড়তে চায় নিশীথ। টাকা নাও, কিন্তু আর এস না; নিশীথের চোখ দুটো যেন নীরবে ধিক্কার দিয়ে এই কথা বলে দিতে চাইছে। কিন্তু সুনয়নার অন্তরাত্মাও যেন নীরবে খিলখিল করে হেসে ওঠে; এবং নিশীথকে একদিন স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছে সুনয়না; টাকা চাই না, দিও না; কিন্তু আমি আসবোই। সাধ্যি থাকে তাড়িয়ে দিও।

—একদিনের ভুলকে চিরকালের ভুল করে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি সুনয়না? বিড়বিড় করে একদিন সুনয়নাকে নিজের মনের

একটা মুখচোরা ঘৃণার আভাস জানিয়ে দেবার জন্য একটু মুখরতা করেছিল নিশীথ।

সুনয়না বলে, ভুলটা এত বিস্বাদ হয়ে গেল কেন? কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে বোধ হয়?

কি করে বোঝাবে নিশীথ, হ্যাঁ, মানুষের জীবন যে ভালবাসাই খোঁজে; ভালবাসাহীন এই গলা-জড়িয়ে-ধরা জীবন যে একটা ভয়ানক শাস্তি। আজীবন সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কিন্তু সুনয়না যেন না-বোঝবার জন্য পণ করে বসে আছে।

শুধু একদিন, কে জানে কোন ভাবনার ব্যথায় ছটফট করে উঠেছিল সুনয়নার মন। কালিকাপুরের পুরনো কালের সেই ছোট পুকুরটা, রূপসাগর যার নাম, তারই ভাঙা ঘাটের পাথুরে সিঁড়ির উপর নিশীথের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লাল শালুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনমনার মত বলে উঠছিল সুনয়না, ভালবাসতে পারলে ভালই হতো, নিশীথ।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে নিশীথ, তার মানে?

—তার মানে, সরে যেতে পারতাম। তুমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে

—অদ্ভুত কথা বলছো।

—কেন?

—আমি তো জানি, মানুষ কাউকে ঘৃণা করলে তবেই তার কাছ থেকে সরে যেতে পারে।

হেসে ফেলে সুনয়না। তবে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারছো না কেন? তুমি তো আমাকে যথেষ্ট ঘেন্না কর।

মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করে নিশীথ, ঘেন্না করি না বোধহয়

—তবে কি?

নিশীথও হাসতে চেষ্টা করে, বোধহয় ভয় করে। শুধু মনে হয়, তোমার ক্ষতি করছি, নিজেরও ক্ষতি করছি।

—আমার ক্ষতি করেছ বৈকি। কিন্তু তোমার কি ক্ষতি হয়েছে, বুঝতে পারছি না। অবশ্য, টাকার দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু···

—কি ?

সুনয়না হাসে, তোমার কি এই ধারণা যে, আরও কম টাকাতে সুনয়নার মত একটা মানুষকে যখন তখন এভাবে এরকম একটা রূপসাগরের নিরালা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে যা-ইচ্ছে-তাই বলা যায় ?

চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ, আমি টাকার ক্ষতির হিসেব করছি না।

—তবে কিসের হিসেব করছো ?

—ফাঁকির হিসেব।

—ফাঁকি ?

—নিশ্চয়। ভালবাসার চিহ্ন নেই, তবু এরকম মেলামেশা··· কোন অর্থ হয় না ; নিছক একটা ফাঁকি নিয়ে পড়ে থাকা।

—তাই বল। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে, আর ভালবাসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

—ঠিক কথা।

—তা হলে কাউকে ভালবেসে ফেল।

—ফেলেছি বোধ হয়।

—তবে তাকে বিয়ে কর।

—নিশ্চয়ই করবো।

—বেশ তো। কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায় ?

আবার চমকে ওঠে নিশীথ, তার মানে ?

—আমার যা দরকার তা পেতেই থাকবো। আমাকে সরিয়ে দেবার সাধ্য তোমার হবে না।

—আমার সাধ্য না হোক ; কিন্তু আর একজনের সাধ্য যে হবে না, এতটা ধারণা করছো কেন ?

—আমাকে বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছো, নিশীথ। খুব ভুল করেছো।

—তুমি আমাকেও বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছো।

—সত্যি কথা।

—কেন ?

—আমাকে তুচ্ছ করবার সাধ্য তোমার নেই; তাই তুমি দুর্বল

নীরব হয়ে যায় নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুনয়না, আমার কথা ভাবতে তোমার মনে যে ঘৃণা লাগে, সেই ঘৃণাকেই যে তুমি ভালবাস। এত বিদ্বান হয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পার না কেন ?

নীরব নিশীথ রায়ের মাথাটাও এইবার হেঁট হয়ে যায়। একটুও মিথ্যে বলেনি, বাড়িয়েও বলেনি সুনয়না। যে নারীকে বেশিক্ষণ কাছে রাখবার জন্য কোন আগ্রহ অনুভব করে না নিশীথ, যে-নারীকে চিরকালের সঙ্গিনী বলে কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে, সেই নারীর হাত ধরবার জন্য কতবার নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে নিশীথ রায়ের এই ভদ্র শরীরের একটা মত্ততা। পরনারীর মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে এহেন ছন্নছাড়া সম্পর্কের অনুভব যে নিশীথ রায়ের বুকের পাঁজরের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অস্বীকার করতে পারে না নিশীথ।

সুনয়না বলে, আমি একটা অনুরোধ করবো, শুনবে ?

—বল।

—তুমি বিয়ে করো না।

—একথা বলবার অধিকার তোমার নেই।

—নেই ঠিকই; কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলছি।

—যে মেয়ে আমাকে ভালবাসে তাকেও বিয়ে করবো না, আমাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া মানে আমার ক্ষতি করা।

সুনয়নার চোখের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে ওঠে।—আজ পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি; কিন্তু যদি বিয়ে কর, তবে ক্ষতি করবো। না করে পারবো না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও তোমার ক্ষতি করে ফেলবো, নিশীথ।

আর কোন কথা না বলে, কালিকাপুরের রূপসাগরের সেই নিরালা থেকে যেন একটা যন্ত্রণাক্ত মূর্তি নিয়ে ছুটে চ'লে গিয়েছিল সুনয়না।

তারপর আর সাতটা দিনও পার হয়নি, আবার কালিকাপুরে এসে ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই একটা নির্মম বিস্ময়ের আঘাতে সুনয়নার প্রাণটাই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের মালী হেসে হেসে খবর দিল, সাহেব বিয়ে করতে গিয়েছেন।

কার সঙ্গে বিয়ে? কোথায় বিয়ে? মালীর কাছে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পায়নি সুনয়না। উত্তর পেয়েছিল কালিকাপুর থেকে ফিরে এসে, গালুডির এই বাঙলো-বাড়ির ভিতরে ঢুকে নিজেরই ঘরের টেবিলের কাছে এসে। ধীরেন বোসের নামে একটা হলদে খামের চিঠি এসেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। রাজপোখরার শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথ রায়ের বিয়ে। ছাপার অক্ষরে লেখা চিঠির এক প্রান্তে হাতের লেখার একটি অনুরোধও রয়েছেঃ তুমি না আসতে পার, অন্ততঃ সুনয়নাকে পাঠিয়ে দিও, ধীরেন। ইতি শীতল সরকার।

আয়নাতে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে সুনয়নার নিজেরই বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ; নিজেরই এ কি ভয়ানক ক্ষতি করলো নিশীথ রায়! নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের ভালবাসাবাসির মূর্খ অহংকারটাকে এই সুনয়না বোস যে এক-মুহূর্তে চূর্ণ করে ধুলো করে দেবে। সুনয়নার চরিত্রহারা রক্তমাংসের আক্রোশগুলিকে কি ভয় করতে ভুলেই গেল নিশীথ রায়? আয়নার

দিকে তাকিয়ে নিজেরই চোখের আগুনের জ্বালাটাকে দেখতে থাকে আর কাঁপতে থাকে সুনয়না।

আর একবার রামগোপাল চৌহানের গাড়ি চেয়ে পাঠাতে হয়, এবং কালিকাপুরেও যেতে হয়। কিন্তু তখনি ফিরে আসতেও হয়। না, ফেরেনি নিশীথ রায়। নীরাজিতাকে সঙ্গে নিয়ে কালিকাপুরে ফিরে আসতে আরও সাতটা দিন দেরি করবে নিশীথ। কালিকা মাইন্‌স-এর কেরানীবাবুর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারে সুনয়না, সাক্‌চিতে বউভাতের অনুষ্ঠানের পর, আরও পাঁচটা দিন ওদিকেই পার করে দিয়ে ম্যানেজার নিশীথ রায় মঙ্গলবার এখানে ফিরবেন।

আর মাত্র তিনটে দিনের অপেক্ষা; সেই অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে একটা ঘণ্টাও বোধ হয় ঘুমোতে পারেনি সুনয়না। এবং ঘুমহারা চোখের সব যন্ত্রণা বিদ্যুতের জ্বালার মত ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো তখন, যখন মঙ্গলবারের বিকালের আলোতে সুনয়নাকে গালুডি থেকে কালিকাপুরে নিয়ে যাবার জন্য কন্‌ট্রাক্টর চৌহানের গাড়ি বাঙলো-বাড়ির দেওদারের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বিকালের আলো যখন রঙীন হয়ে এসেছে, কালিকাপুরের শালবনের উপরে উড়ন্ত পাখিগুলিকে যখন রঙীন আলোর উড়ন্ত ফুলের ঝাঁক বলে মনে হয়, তখন কালিকা মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের ফটকের কাছে কণ্ট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও তীব্রস্বরের হর্ন বাজিয়ে উড়ন্ত আক্রোশের মত হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর থেমে যায়।

গাড়ি থেকে নামে না সুনয়না। গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, নিজেরই দুই চোখের বিদ্যুতের জ্বালা জোর করে চোখেরই উপর সুস্থির করে রেখে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বারান্দায় কেউ নেই। বারান্দার গা-ঘেঁষা প্রথম ঘরের দরজায় যে পর্দাটা ফুরফুর করে উড়ছে, সেই পর্দার দিকে চোখ পড়তেই সুনয়নার দুচোখের জ্বালাময় চাহনিতে একটা নতুন হাসির শিহর লাগে। সুনয়নার চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আবেগে ফুরফুর করে উড়তে থাকে। লাল ভেলভেটের চটি-পরা এক জোড়া পা, আর লালচে মেঘের মত রঙের একটা সিল্কের শাড়ির আঁচল দেখা যায়। কালিকা মাইন্‌স-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনের নীড়ে নব-বিহগীর আবির্ভাব ; নতুন সুখের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে সেই নীড়।

—আর একবার হর্ন বাজাও, ড্রাইভার! আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সেই ঘরের ভিতরের রঙীন আবির্ভাবের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে সুনয়না। ড্রাইভার আবার হর্ন বাজায়।

কণ্ট্রাক্টর চৌহানের এই গাড়ির হর্নের শব্দ চিনতে নিশীথ রায়ের পক্ষে একটুও অসুবিধা নেই ; বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি করবার কথা নয়। জানে সুনয়না, এবং সুনয়নার বুকের ভিতরের আক্রোশটাও আশায় ছটফট করছে, এই মুহূর্তে চমকে উঠবে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়াবে নিশীথ রায় ; আর, এক জোড়া ভীত ও করুণ চোখের দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এই গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তারপর আর কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে নিশীথ রায়? আস্তে আস্তে, ঐ ভীরুতারই ভারে অতিষ্ঠ হয়ে সুনয়নার এই দুই চোখের চাহনির কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। সুনয়না বলবে, চল, বেড়িয়ে আসি। এখনই চল। ওজর আপত্তি শুনতে চাই না। এখনই যেতে হবে।

সুনয়নার সেই আহ্বান অস্বীকার করতে পারবে কি নিশীথ রায়? সাধ্য হবে কি?

সুনয়নার কল্পনার ভাষাগুলিই যেন নীরবে হেসে ওঠে। রুমাল তুলে ছুই ঠোঁটের অদ্ভুত এক থরথর হাসির কাঁপুনি চেপে রাখতে চেষ্টা করে সুনয়না।

নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? রূপসাগর নামে সেই সেকেলের ইতিহাসের ছোট পুকুরটা বেশি দূরে নয়। বড় বড় তালের ছায়ায় রূপসাগরের কিনারার সেই নির্জন নিভৃতের অনেক জায়গা এখনও নরম ঘাসে ছেয়ে রয়েছে। সেই নিভৃতের আবেদন ভুলে যাবার সাধ্য হবে কি এই নিশীথ রায়ের? সেখানে গিয়ে আজও এই মুহূর্তে নিশীথ রায়ের হাত ধরে যদি সুনয়না, তবে নিশীথ রায়ের চোখ ছুটো সুনয়নার মুখের দিকে পাগলের মত না তাকিয়ে থাকতে পারবে কি?

থাক রূপসাগরের ছায়াময় নির্জনতা আর নিভৃত। কালিকাপুরের শালবনের কিনারা ধরে এগিয়ে গিয়ে লালমাটির কাঁচা সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কালো ঢিপির মত ছোট পাহাড়ের যে-কোন একটা পাথরের উপরে বসে, সূর্যাস্তের শেষ আভার দিকে তাকিয়ে নিশীথ রায়কে যদি প্রশ্ন করা যায়, কি ইচ্ছে করছে, নিশীথ? আমার কাছ থেকে এখনই উঠে যেতে চাও? এখনি ঘরে ফিরতে মন চাইছে? আমি বলছি, না, যেও না।

চলে যেতে সাধ্য হবে কি নিশীথ রায়ের? আবার মুখের উপর রুমাল বুলিয়ে যেন একটা হাসির জ্বালা মুছতে থাকে সুনয়না। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ বিয়ে করুক, কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন নিশীথ রায়? নিজেকেই চিনতে আর বুঝতে ভুল করলে কেন? বিশ্বাস করলে না কেন যে, তুমিও ডুবে গিয়েছ? সুনয়না বোস তোমার সেই ডুবন্ত জীবনের সঙ্গিনী।

না, রূপসাগর নামে পুকুরটার কিনারাতে নয়; শালবনের শেষের সেই ছোট পাহাড়ের পাথরের উপরেও নয়; আজ নিশীথ রায়কে তার এই মিথ্যা খেলাঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে

ওঁকেবা র গালুডিতে চলে গেলেই ভাল। গালুডির বাড়ির বারান্দার উপরে সেই বেতের চেয়ারের উপর বসে স্নুনয়নার হাতের যত্ন আর আগ্রহের ছোঁয়া দিয়ে তৈরী এক পেয়ালা চা খেয়ে নিক নিশীথ; দেওদারের ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ুক গালুডির রাঙামাটির মাঠ। ঘরের আলো জ্বলে উঠুক। স্নুনয়না বোসের মুখটা ভাল করে নিশীথ রায়ের চোখে পড়ুক। তারপর দেখা যাক, আজকের রাত শেষ না হবার আগে কি করে কালিকাপুরে ফিরে আসতে পারে নিশীথ রায়?

স্নুনয়না বোসের কল্পনা এইবার একটা প্রতিজ্ঞার মত যেন নিরেট কঠোর আর নির্মম হয়ে ওঠে। তাই ভাল। নিশীথ রায় যেন আজ তার মন প্রাণ আর আত্মার হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলতে পারে যে, ডুবন্ত জীবনের পাঁক থেকে মুক্ত হয়ে তীরে উঠবার মত শক্তিও তার নেই, সাহসও নেই; ভালবেসে বিয়ে-করা জীবনের রঙীন নীড়টাই ভুয়ো; বিশ্বাস করবার চরম স্নুযোগ পেয়ে যাক নিশীথ, স্নুনয়নাকে তুচ্ছ করবার ইচ্ছাটাও একটা কপট ইচ্ছা।

আর, সারারাত ধরে এই কোয়ার্টারের একটি ঘরের নিভৃতে নিশীথ রায়ের অপেক্ষায় জেগে বসে থেকে আজই বুঝে ফেলুক নীরাজিতা, কেমন মানুষকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে।

কিন্তু ও কে? গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে আর গাড়ির দিকে তাকিয়েছে যে, সে তো নিশীথ রায় নয়। নীরাজিতাও নয়। কিন্তু স্নুনয়নার চোখের অপরিচিত কোন মূর্তিও নয়। ও যে প্রতিভা!

সেই প্রতিভা; চোখে সেই সোনার ফ্রেমের চশমা। স্নুনয়নার দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের আবেশ থমথম করে। প্রতিভা এখানে, তবে মিহির মিত্র কোথায়?

প্রতিভাদের কলকাতার বাড়িটাকে এখনও যেন স্পষ্ট করে চোখে দেখতে পাচ্ছে স্নুনয়না। প্রতিভার বাবা শিবদাসবাবু

সম্পর্কের দিক দিয়ে পরেশদার খুড়শ্বশুর হন। বৌদির সঙ্গে কয়েকবার প্রতিভাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রতিভার সঙ্গে চেনা-শোনার যে সূচনা হয়েছিল, সেটা তিন বছরের অন্তরঙ্গতায় কী সুদূর বন্ধুত্বের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল! সেই তিন বছরের স্মৃতি আজও সুনয়নার মনে একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। মনে আছে সবই; প্রতিভার সঙ্গে শেষ দেখার ঘটনার সেই ছবিও মনে আছে।

সুনয়নার মাথার ভিতরে একটা ভয়ানক বিস্ময়ের বিদ্রূপও বাজতে থাকে। যে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন, সেই শেষ দেখার দিনে কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না, আজ যে সেই প্রতিভা সুনয়নার এই মুখ এখানে দেখতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে। তুমি এখানে কেন, সুনয়না? প্রতিভার প্রচণ্ড বিস্ময়ের এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে সুনয়না?

জানতো সুনয়না, এবং কে না জানতো যে, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার ভালবাসা হয়েছে; মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হবে। কে না দেখতে পেয়েছিল, মিহির মিত্রের সঙ্গে প্রতিভার মেলামেশার রীতিনীতির মধ্যে কোন কুণ্ঠার বালাই নেই? যারা সব খবর জানতো না, তারা মিহির আর প্রতিভাকে একসঙ্গে দেখে স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে করে ফেলতো। কিন্তু সুনয়না কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিয়ে না হতেই প্রতিভার মত মেয়ে…

সত্যিই, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে ভয় পেয়ে সেদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

সিনেমার ছবি দেখবার জন্য সন্ধ্যাবেলা প্রতিভাকে ডাকতে এসেছিল সুনয়না। এবং ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই শিউরে উঠেছিল সুনয়নার চোখ। আর, দুহাতে চোখ ঢেকে, ভয় লজ্জা দুঃখ আর ঘৃণারও একটা দুঃসহ আলোড়ন বুকের ভিতরে চেপে রেখে ঘর ছেড়ে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। মিহির মিত্র প্রতিভার ভালবাসার মানুষ হলেনই বা,

কিন্তু স্বামী তো নন। কিন্তু একি অদ্ভুত দুঃসাহস প্রতিভার! প্রতিভার শরীরের রক্তে কি একটুও ভয় নেই, লজ্জা নেই?

প্রতিভাদের বাড়ির বারান্দায় মাত্র আর পাঁচ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুনয়না। প্রতিভাও সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কি আশ্চর্য, সুনয়নাকে চোখ মুছতে দেখে, আর সুনয়নার মুখটাকে আতঙ্কিত হতে দেখে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা। লজ্জার ব্যাপার বলতে পার; কিন্তু এতে তোমার কাঁদবার কি আছে, সুনয়না? ভয় পেলে কেন?

—ছিঃ। শুধু এই ঘৃণার কথা কোনমতে বলতে পেরেছিল আর চলে গিয়েছিল সুনয়না। দুই বান্ধবীর মধ্যে সেই শেষ দেখা আর শেষ কথা। তার পর এই আজ।

সুনয়নার মুখের সেই ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা যেন তিন বছর পরে ছুটে এসে সুনয়নারই জীবনের উপর এক প্রচণ্ড কৌতুকের ধ্বনি হয়ে এই মুহূর্তে বেজে উঠবে। মাথা হেঁট করে সুনয়না, আর অনুমান করতে পারে; এইবার আস্তে আস্তে হেঁটে এই গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে প্রতিভা; প্রতিভার মুখটা বোধহয় এক মিনিট ধরে হো হো করে হেসে নিয়ে তারপরেই চেঁচিয়ে উঠবে ছিঃ।

কোথায় গেল আর কেমন করে কিসের অভিশাপে পুড়ে গেল তিন বছর আগের সুনয়নার সেই ভয়, লজ্জা আর ঘৃণার অহঙ্কার। প্রথমে বুঝতে পারেনি সুনয়না, চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে বলেই মাথাটা আপনি হেঁট হয়ে গিয়েছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে চমকে ওঠে, এবং সন্দেহ করে; সত্যিই কি আজ তিন বছর আগের সুনয়নার সেই অহঙ্কারের জন্য একটা মমতার কান্না এসে সুনয়নার অন্তরাত্মায় ছটফট করে উঠেছে? ঘৃণা করছে নিজেকে? লজ্জা পেল, ভয় পেল কি গালুডির সুনয়না?

—এস সুনয়না! সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ খুশির স্বরের আহ্বান শুনেই

মুখ তোলে সুনয়না। হ্যাঁ, প্রতিভা এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে আর ডাকছে।

সুনয়না হাসে, আশ্চর্য!

—কিসের আশ্চর্য ?

—তোমাকে এখানে দেখতে পাব বলে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

—আমিও যে ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

গাড়ি থেকে নামে সুনয়না। তুমিও খুব আশ্চর্য হয়েছ বল ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—অন্য কাউকে দেখতে পেলে আশ্চর্য হতাম না। তুমি বলেই—

সুনয়নার মুখের হাসি হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিনবছর আগের সুনয়নার জীবনের গৌরব যেন বুকের ভিতরে আর্তনাদ করে উঠেছে! কি ভয়ানক ধিক্কার প্রতিভার এই সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের মধ্যে বেজে উঠেছে!

সুনয়না আস্তে আস্তে বলে, নিশীথবাবু কোথায় ?

—মাইন্‌স অফিসে গিয়েছে। ডেকে পাঠাবো ?

প্রতিভার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। না। আমি নিজেই যাব।

প্রতিভা হাসে, এখনি যাবে ?

—হ্যাঁ। আর, এখনি নিশীথবাবুকে একবার গালুডিতে নিয়ে যাব।

—দরকার থাকলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

—তুমি অনুমতি না দিলেও চলবে।

—ছিঃ, এ কি কথা বলছো, সুনয়না!

শিউরে ওঠে সুনয়নার চোখ। ছিঃ, সত্যিই যে তিনবছর আগের ধিক্কারের প্রতিধ্বনিটা বেজে উঠেছে!

কিছুক্ষণ আনমনার মত কি যেন ভাবে সুনয়না; তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে। তুমি বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ, প্রতিভা।

—বিশ্বাস কর সুনয়না, একটুও ভয় পাইনি।

—একটা ঠাট্টা করেছি শুধু। সত্যিই কি বিশ্বাস করলে যে তোমার নিশীথবাবুকে গালুডিতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি?

—নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি কি?

সুনয়না হাসে, ক্ষতি নেই?

—না।

—এমন বিশ্বাস কেমন করে হলো?

—জানি না।

—মস্ত বড় বিশ্বাস পেয়েছো, প্রতিভা। সবচেয়ে ভাল হতো, যদি তোমার নিশীথবাবুও এই বিশ্বাস পেতেন।

—আমার মনে হয়, নিশীথও তাই বিশ্বাস করে।

—কি?

—তারও কোন ক্ষতি হবে না।

—তার মানে?

—আমাকে জানে নিশীথ।

—কি জানে?

—সবই জানে।

—কেমন করে জানতে পারলে?

—আমিই জানিয়েছি।

—তবুও ভালবাসা হলো?

প্রতিভা হাসে, সেইজন্যেই ভালবাসা হলো।

—কিন্তু তুমি কি কিছু জেনেছিলে?

—নিশীথের কথা বলছো ?

—হ্যাঁ,।

—নিশীথই জানিয়েছে।

—বিয়ের পরে ?

—বিয়ের আগে। তা না হলে এ বিয়ে হতোই না।

স্নয়নার মনের ভিতরে এতক্ষণের প্রতিজ্ঞার উল্লাস যেন হঠাৎ আহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। প্রতিভার কাছে হার মানতে হচ্ছে যে! কী কঠিন প্রতিভার বিশ্বাস! কত উদার প্রতিভার সাহস! প্রতিভার জীবনকে ভয় পাইয়ে বিষণ্ন করে দেবার শক্তি নেই স্নয়নার। অন্য কোন মেয়ে নয়; নিখুঁত চরিত্রের নীরাজিতা নয়। এ যে সেই প্রতিভা!

এবং প্রতিভা বলেই যে অদ্ভুত একটা মায়ার ছোঁয়া লেগে স্নয়নার আক্রোশটাও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভা আর নিশীথ, বেচারা এই দুটি মানুষ যে দুটি আহত জীবনের মানুষ। অনেক আশা করে দুজনে দুজনের ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে চাইছে।

হেসে হেসে আর ঠাট্টা করতে পারেনা স্নয়না। স্নয়নার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে করুণ অভিনন্দনের মত ফিসফিস করে।
—তোমরা দুজনেই দেখছি মস্ত মহৎ…আশ্চর্য!…হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে অন্যরকমের খবর পেয়েছিলাম, প্রতিভা।

—কি ?

—শুনেছিলাম, এমন কি নিমন্ত্রণের চিঠিও পেয়েছিলাম, নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে।

—ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে বিয়ে হলো না।

—কেন ?

—নিশীথের চরিত্রে নাকি দাগ আছে; কে যেন সে খবর নীরাজিতার বাবা শীতলবাবুকে জানিয়েছে।

—তাইতেই বিয়ে ভেঙে গেল ?

—হ্যাঁ। নীরাজিতা সরকারের পাণিগ্রহণের জন্য রাজপোখরাতে গিয়ে দেখতে পেলেন নিশীথ রায়, শীতল সরকারের বাড়ি অলক্তকের ফটক বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই।

সুনয়নার চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। কি বলছো, প্রতিভা!

—একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি কথা বলছি।

—মানুষকে এমন অপমানও করতে পারে মানুষ? নীরাজিতারও কি মাথা খারাপ হয়েছিল?

—জানি না।

—চমৎকার দুর্ঘটনা!

—হ্যাঁ, চমৎকার দুর্ঘটনাই বটে। তা না হলে, আমাকে আর এখানে আসতে হতো না।

সুনয়না যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে, ক্লান্তভাবে বলে, খুব ভাল করেছ প্রতিভা। তুমি একটা ভদ্রলোকের জীবনকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছ। খুব ভাল হলো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কি যেন ভাবতে থাকে সুনয়না। তারপর মুখের চেহারাটা যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরটা কুণ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করে আরও কঠোর একটা কৌতূহলের চঞ্চলতা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে সুনয়না। কিন্তু পারছে না। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চায়; বার বার কেঁপে ওঠে সুনয়নার ঠোঁট দুটো।

প্রতিভা বলে, তুমি কি যেন বলতে চাইছো, সুনয়না।

—সামান্য একটা কথা জানবার ছিল, না জানলেও চলে… অর্থাৎ…

—আমি বলতে পারি, তুমি কার কথা জিজ্ঞেসা করতে চাইছো।

—তার মানে…

—তার মানে, মিহির মিত্রের কথা জিজ্ঞেসা করতে চাইছো

—হ্যাঁ।

—সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। লণ্ডন থেকেই একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আমাকে ভাবতেই ভয় পায় মিহির মিত্র।

সুনয়না আশ্চর্য হয়, কিসের ভয়?

—চরিত্রের ভয়।

—কার চরিত্র?

—আমার।

আবার আনমনার মত বিড়বিড় করে সুনয়না, মানুষ মানুষকে এমন অপমান করতে পারে!

—কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ করবার দরকার কি সুনয়না? মানুষ মানুষকে সম্মান করতে পারে, সেটাও তো দেখতে পাচ্ছ।

—কি?

—নিশীথ আমাকে বিয়ে করেছে। এর চেয়ে বেশি সম্মান কোন পুরুষ কি কোন মেয়েকে···

—নিশ্চয়, প্রতিভা। খুব সত্যি কথা। খুব ভাল হলো। নিশীথ-বাবু মানুষের মত মানুষ বলেই···

হঠাৎ কথা বন্ধ করে সুনয়না। আর, প্রতিভাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে সুনয়না।

—এ কি ব্যাপার, সুনয়না? প্রশ্ন করেই প্রতিভা অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

—খুব ভাল হলো, প্রতিভা। সুনয়নার চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের শান্ত। সুনয়নার গলার স্বরে যেন নিবিড় এক সান্ত্বনার আবেগ টলমল করে। হঠাৎ যেন সুনয়নার জীবনটাই সুখী হয়ে গেল, পরম নিশ্চিন্ততার আবেশে শান্ত হয়ে গেল।

—চল প্রতিভা, তোমার ঘরের ভিতরে বসে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে তারপর চলে যাব।···তুমি আজই এসেছ?

—কাল এসেছি।

—সাকৃচিতে বউভাত হলো বোধহয়।

—হ্যাঁ।

—তোমার জেঠাশ্বশুর হরদয়ালবাবু চমৎকার মানুষ। ওঁরা সবাই নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন?

—সবাই বড় বেশি খুশি হয়েছে।

সুনয়না হাসে, হওয়াই উচিত। এবার নিজেরা দুটিতে মিলে-মিশে খুশি হয়ে আর সুখী হয়ে থাক।

ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রতিভার সঙ্গে গল্প করতে করতে সুনয়না যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাও ভুলেই গিয়েছে। ঘরের চেহারাটা এবার বদলে দিতে হবে, প্রতিভা। এ ঘরে এসব টেবিল চেয়ার রাখবে না। এই ঘর শুধু তোমাদের দুজনের গল্প করবার ঘর। বাইরের কেউ যেন এখানে এসে না বসে।

ঘরের এদিক-ওদিকে আর আলনার উপর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে সুনয়না বলে, আমি গালুডি থেকে তোমার জন্য একজন ঝি পাঠিয়ে দেব। খুব ভাল কাজ জানে, খুব পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মানুষ। চমৎকার ঘর গোছাতে পারে ঝিটা। তোমার অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট বেঁচে যাবে, প্রতিভা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দূরের শালবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে সুনয়নার মুখরতা যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এখানে বেড়াবার মত অজস্র ভাল ভাল আর বড় সুন্দর জায়গা আছে, প্রতিভা। নিশীথবাবু হয়তো এবার ঘরকুনো হবার জন্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু তুমি বাধা দিও। রোজ সকালে একবার, আর সন্ধ্যায় একবার দুজনে মিলে বেড়িয়ে এস। ...আচ্ছা, আমি চলি এবার, প্রতিভা। নিশীথবাবুকে বলো, আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। একদিন সময় করে দুজনে গালুডিতে আমার ওখানে যেও, কেমন?

—একটু অপেক্ষা কর সুনয়না। নিশীথের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলেই ভাল হয় না কি?

সুনয়না ছটফট করে ওঠে, না, প্রতিভা। আমি চলি। নিশীথবাবুকে বলো, যেন আমার অভদ্রতার জন্য কিছু না মনে করেন।

সুনয়নার সঙ্গে ফটক পর্যন্ত হেঁটে এসে প্রতিভাও গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সুনয়না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর আবার অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হেসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়। একটা অনুরোধ ছিল, প্রতিভা।

—বল।

—কালকেই কি যেতে পারবে?

—আমার পক্ষে না পারবার তো কথা নয়। কিন্তু নিশীথের যদি কোন কাজ থাকে, তবে…

সুনয়না বলে, তবুও চেষ্টা করো, প্রতিভা। একটু তাড়াতাড়ি করো…কালই যদি যেতে পার তবে বড় ভাল হয়…নইলে…

কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল সুনয়না।

আর, কণ্ট্রাক্টর চৌহানের গাড়িও শব্দ করে স্টার্ট নিয়ে কালিকা-পুরের সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

গালুডির বাঙলো-বাড়ির গেটের দেওদারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সুনয়না। একটা কাচের গেলাস আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। বাড়িটার বুকের একটা ভয়ানক পিপাসার স্বপ্ন যেন আর্তনাদ করে উঠেছে। ধীরেন বোস তাহলে কলকাতা থেকে আজই ফিরে এসেছে।

অন্যদিন হলে, এই একটা সামান্য গেলাসের আছাড় খাওয়া শব্দ শুনেই সুনয়নার মুখের উপর এক ঘৃণার জ্বালা ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুনয়নার জীবনটা যেন সব অভিযোগের বেদনা

হারিয়ে একেবারে হালকা হয়ে ফিরে এসেছে। সুনয়নার লজ্জাহীন রক্তমাংসের আক্রোশগুলিও যেন ভস্ম হয়ে ঝরে গিয়েছে। পৃথিবীর কারও উপর এক বিন্দু রাগ নেই ; বরং, মনে হয় সুনয়নার প্রাণটাই যেন একটা পঙ্কিল হিংসার রসাতলে তলিয়ে যাবার গ্লানি থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কালিকাপুরের দুটি মানুষ, সেই দুই সুন্দর স্বামী-স্ত্রী বেচারার সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করে চলে আসতে পেরেছে সুনয়না।

ধীরেন বোস নামে যে মানুষটার হাতের গেলাস খসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই মানুষটার উপরেও যে একটুও রাগ হয় না। যেমন আছে থাকুক, যা নিয়ে থাকতে ভাল লাগে তাই নিয়ে ভাল থাকুক মানুষটা। ওকে ঘৃণা করবার কোন অধিকার নেই সুনয়নার। এতদিন যে ঘৃণা করেছে সুনয়না, সেটা তো সুনয়নারই জীবনের একটা মাতাল অভিমানের রাগ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার থমকে দাঁড়ায় সুনয়না। একটা সোফার উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ধীরেন বোস। হুইস্কির বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। সোফার কাছে ছোট একটা টেবিলের উপর অনেক কাগজপত্র পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্যের যে কারবার করে এসেছে ধীরেন বোস, তারই নথিপত্রের কতগুলি আবর্জনা।

অন্যদিন হলে, ধীরেন বোসের এই চেহারার দিকে, নেশায় বিগলিত এই অস্থিহীন ও অর্ধলুণ্ঠিত অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে নিজের ঘরের দিকে চলে যেত সুনয়না। কিন্তু আজ বোধহয় শুধু একবার ভ্রূক্ষেপ করেই চলে যেতে চায়।

তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখে যেন একটা নতুন বিস্ময়ের চমক লাগে। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। ধীরেন বোসের চেহারাটা যেন সোফার উপরে পড়ে আগুনে পোড়া সাপের মত কাতরাচ্ছে। নেশা করে শরীরটাকে এবং সেই সঙ্গে বোধহয় মন, প্রাণ আর

আত্মার সব সাড়াও অবশ করে পড়ে থাকাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এরকম জ্বালাময় অস্থিরতা নিতান্তই ব্যতিক্রম। সন্দেহ হয় সুনয়নার, কলকাতা থেকে কি একটা জ্বরের জ্বালা কিংবা কঠিন কোন অসুখের অস্বস্তি নিয়ে গালুডি ফিরে এসেছে মানুষটা ?

দেখতে পেয়েছে ধীরেন বোস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনয়না। সুনয়নার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ধীরেন বোস। এটাও ধীরেন বোসের অভ্যাসের ব্যতিক্রম। এমন অবস্থায় সুনয়নাকে দেখলে একবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠাই ধীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এবং ধীরেন বোসের সেই বিদঘুটে আনন্দের আওয়াজটাকে ঘৃণা করে তৎক্ষণাৎ অন্য ঘরে চলে যাওয়া সুনয়নারও জীবনের নিয়ম।

আজ কিন্তু চলে যায়না সুনয়না। ধীরেন বোসের চোখের দৃষ্টি যেন একটা নীরব হাহাকার। যেন ভয়ানক একটা ছায়া দেখে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে ধীরেন বোস।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আস্তে আস্তে হেঁটে ধীরেনের কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না, কখন কলকাতা থেকে ফিরলে ?

—এই তো, সন্ধ্যার একটু আগে।

—চা-খাবার খেয়েছ ?

—অ্যাঁ ? চমকে ওঠে ধীরেন বোস।

—চা-খাবার !

—কোথায় চা-খাবার ? কে দেবে ?

—কেন ? শুকদেব বাড়িতে ছিল না ?

—ছিল।

—তবে ?

—কিন্তু শুকদেব কেন মিছিমিছি আমাকে চা-খাবার খাওয়াবে !

—তুমি চেয়েছিলে ?

—না !

—কেন ?

ধীরেন হাসে—শুকদেবের কাছে চা-খাবার কবেই বা চেয়েছিলাম ? তা ছাড়া···

—কি ?

—বেচারা শুকদেবকে বিরক্ত করে লাভ কি ? ওর কাছ থেকে চেয়ে চা-খাবার খেয়েই বা লাভ কি ?

—কিন্তু আজকাল আমার কাছ থেকেও তো চা-খাবার কোনদিন তোমাকে চাইতে দেখি না।

—তা তো বটে। তোমাকেও বিরক্ত করতে চাই না বলেই—

সুনয়না হাসে, ভাল কথা···আচ্ছা, একটু ভাল হয়ে বসো ; চা-খাবার আনছি।

সুনয়নার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় ধীরেন বোস। নেশাক্ত আর অবসন্ন চোখ তুটো যেন একটা মৃত্যুময় অন্ধকারের কবর থেকে হঠাৎ উঁকি দিয়ে একটা অকল্প্য আলোকের দিকে তাকিয়েছে। বড় বেশি বিস্মিত হয়েছে ধীরেনের নেশাক্ত চোখ। কিন্তু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে যায় সুনয়না।

পনেরো মিনিটও সময় লাগে না। চা-খাবার নিয়ে ধীরেন বোসের সেই অদ্ভুত এক নতুন জাগরণের তুই চোখের বিহ্বল দৃষ্টির কাছে এসে দাঁড়ায় সুনয়না। চা-খাবায় খায় ধীরেন বোস ; আর সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে ধীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জানে না, এবং হিসাবও রাখে না সুনয়না, চা-খাবার খেয়ে একটা হাত আলগাভাবে এগিয়ে দিয়ে কতক্ষণ ধরে বসে আছে ধীরেন। বুঝতে পেরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুনয়না। এক গেলাস জল নিয়ে এসে নিজেরই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ধীরেনের শিথিল হাতটাকে ধুয়ে দেবার পর তোয়ালে খোঁজে। ধীরেনের হাতটাকে মুছে দেবার পর আবার চুপ করে দাঁড়ায়। আস্তে একবার হাঁপ ছাড়ে সুনয়না ; তার পরেই চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

ধীরেন বলে, একটা চিঠি ছিল।

মুখ ফেরায় সুনয়না। চিঠি?

—হ্যাঁ। রাজপোখরা থেকে শীতলকাকা আমাকে লিখেছেন।

সুনয়নার হাতে ছুটো চিঠি তুলে দিয়ে ধীরেন বলে, সেই সঙ্গে আর একটা চিঠিও আছে। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু শীতলকাকাকে যে চিঠিটা লিখেছেন।

ধীরেন বোসের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, অবিচল ও নিষ্কম্প মূর্তি নিয়ে চিঠি ছুটো পড়তে থাকে সুনয়না; এবং পড়া শেষ হতেই চিঠি ছুটো টেবিলের উপর রেখে দেয়।

ধীরেন বোসের স্ত্রী সুনয়না বোসের এই শান্ত ও সুন্দর রক্ত-মাংসের এক ভয়ঙ্কর অনাচারের তদন্ত করে যেন সংসারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছে এই ছুই চিঠি। কিন্তু একটিও মিথ্যে কথা বলেছে কি? একটিও না। একটুও বাড়িয়ে লেখেনি খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতিবাবু; সুনয়না বোসের চরিত্র একটা অভিশাপ মাত্র। নিশীথ রায়ের জীবনকে ক্লেদাক্ত করেছে সুনয়নার নিঃশ্বাসের গোপন ছুঃসাহস।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সুনয়নার শান্ত ও গম্ভীর মুখের উপর একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যেন দূর প্রদীপের আলোর মত মিটমিট করে। তারপরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সোফার কাছে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে ধীরেনের মাথায় হাত রাখে সুনয়না।

ধীরেন বোসের নেশাক্ত চোখের বিস্ময়কে আবার নতুন করে চমকে ওঠবারও সুযোগ দেয়না সুনয়না। এক হাতে ধীরেনের মাথা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ধীরেনের মাথার উপর নিজেরও মাথাটাকে কাত করে পেতে দেয়; আর, ধীরেনের কপালে হাত বোলাতে থাকে। তার পর...

তারপর বোধহয় একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ধীরেন বোসের অলস সত্ত্বাটাই। যখন হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় ধীরেন

তখন বুঝতে পারে, অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে সুনয়না। দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা রাত ন'টার ঘর পার হয়ে গিয়েছে; শুধু টিক টিক করে বাজছে ঘরের শূন্যতা।

সোফা থেকে নামে ধীরেন। চটি পায়ে দিতে ভুলে যায়। বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ধীরেন। যেন সুনয়নাকে কি একটা কথা বলবার ছিল; এবং সে কথা না শুনেই চলে গিয়েছে সুনয়না।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি সুনয়না? ঘর থেকে বের হয়ে এবং বারান্দা পার হয়ে সুনয়নার ঘরের ভিতর ঢোকে ধীরেন বোস। হ্যাঁ, ঠিকই সন্দেহ করেছিল ধীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছে সুনয়না। কিন্তু বিছানার উপরে নয়। একটা চেয়ারের উপর, একেবারে নিঝুম হয়ে বসে আছে সুনয়না, মাথাটা যেন দুর্ভর ক্লান্তির ঘোরে একদিকে কাত হয়ে আছে। চোখ দুটো কুঁচকে আছে; আর চোখের কোলের সিক্ত কাজল কাদা হয়ে রয়েছে।

সুনয়নার হাতে ছোট একটা শিশি। কোলের উপর ছোট হাত-ব্যাগটা হাঁ করে পড়ে আছে!

হাত বাড়িয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটাকে আস্তে আস্তে তুলে নেয় ধীরেন।

চমকে ওঠে, চোখ মেলে তাকায় সুনয়না, আর শিশিশুদ্ধ ধীরেনের হাতটাকে চেপে ধরে।

হেসে ফেলে ধীরেন।—এটা আমারই দরকার; তোমার দরকার নয়।

—ছিঃ! শিশিটা কাড়বার চেষ্টা করে সুনয়না।

ধীরেন হাসে, তা হয় না, সুনয়না। আমাকে যেতে দাও।

—কিন্তু তাতে কি আমার যাওয়া তুমি আটকাতে পারবে?

—তা জানি না। তোমার যাবার ইচ্ছে থাকলে যেও; কিন্তু আমাকে আগেই যেতে হবে।

আরও শক্ত করে, তুহাত দিয়ে ধীরেনের হাতটাকে যেন খিমচে ধরে সুনয়না। একটা দয়া করবে?

—বল।

—তোমার পায়ে পড়ি; আমাকে আগে যেতে দাও।

সত্যিই, সুনয়না যেন একটা তুর্বার আনন্দের জ্বালায় হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে; আর ধীরেন বোসের চটিহীন পা তুটোর উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে, সেই হাত মাথায় ছুঁইয়ে, আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সুনয়না।

ধীরেন তবু অবিকার ও অবিচল। তা হয় না, সুনয়না। বড় জোর…

—কি?

—বড় জোর এই বিষ তুভাগ করে, তুজনে এক সঙ্গেই…

চেঁচিয়ে ওঠে সুনয়না। ঠিক, ঠিক বলেছ। তবে আর দেরি করোনা, লক্ষ্মীটি; দয়া করে আমার পাশে বসো।…এস…

আয়না-টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে সুনয়নারই সঙ্গে এক চেয়ারের উপর বসে ধীরেন বোস। শিশির ভিতরে যে শান্ত ও সুন্দর ক্ষমার মধুরতা তরল হয়ে টলটল করছে, সে মধুরতাকে গেলাসে ঢেলে তু'ভাগ করে ধীরেন।

সুনয়নার হাতে শিশিটা, আর ধীরেনের হাতে ছোট গেলাসটা। সুনয়নার মুখের দিকে তাকায় ধীরেন।

—কি বলছো?

—মনে কোন তুঃখ নেই তো সুনয়না?

—না।

—কোন রাগ?

—একটুও না। কিন্তু তুমি?

—কি?

—আমার উপর কোন ঘেন্না…

—ছিঃ

—তবে ?

সুনয়নার ঠোঁট দুটো যেন বিপুল পিপাসার আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যাবার আগে একটা চরম স্পর্শের স্বাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সুনয়না।

এক হাতে সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় ধীরেন, সুনয়নার দুই ঠোঁটের সেই শিহরিত পিপাসার দিকে লোভীর মত তাকায়। নিশ্চিন্ত হতে চায় ধীরেনও। এবং বুঝে নিতে চায়, শেষ পর্যন্ত ভালবেসেই চলে যাওয়া গেল। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ?

শেষ চুমোর তপ্ততা যেন শান্ত হতে চায় না। বিষের ছোঁয়া বরণ করে ভিন্ন আর ছিন্ন হবার আগে দুটি জীবনের ক্ষত যেন মিলনের উৎসবে বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

বাইরের ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সময়ের শব্দটা যেন আচমকা ঝঙ্কারের মত বেজে ওঠে। ধীরেন বলে, আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, সুনয়না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করছে।

—কেন ?

ধীরেনের দুচোখ থেকে ঝরঝর করে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে। এভাবে গলাগলি হয়ে দুজনের মরে না গিয়ে এভাবে বেঁচে থাকলে ক্ষতি কি হতো, সুনয়না।

—কি বললে ? মুখ তুলে ধীরেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটা যেন পিছলে পড়ে যেতে চায়।

—এভাবে দুজনের বেঁচে থাকার সাধ্য কি হবে না ?

—খুব সাধ্য হবে।

ধীরেনের হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিয়ে, গেলাস আর শিশি, দুটি বস্তুকেই একসঙ্গে আঁকড়ে ধরে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দেয় সুনয়না।

সুনয়নাকে নিয়ে গাড়িটা সড়কের লাল ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ফটকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিভা। প্রতিভার মনের ভাবনাগুলিকে যেন একটা দুরন্ত হেঁয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে, আর নিজের জীবনটাকে সব হেঁয়ালির গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, একেবারে হালকা হয়ে চলে গেল সুনয়না।

ভয় পেয়েছে কি সুনয়না? কিন্তু কই, সুনয়নার চোখে তো ভয়ের কোন ছায়া দেখা গেল না? ভয় পেলে কি মানুষের মুখ অমন শান্ত ও সুন্দর হাসিতে ছেয়ে যেতে পারে?

তবে কি হার মেনে, হতাশ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে নিজের জীবনের একটা বিদ্রূপের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল সুনয়না?

তাও যে মনে হয় না। যার বুকের ভিতরে আক্রোশের জ্বালা থাকে, বিফল স্বপ্নের অভিমান থাকে, কিংবা ব্যর্থ অহংকারের বেদনা থাকে, সে কি এমন করে খুশি হয়ে, শুভ ইচ্ছার উপহার দিয়ে আর অবাধ প্রীতি জানিয়ে চলে যেতে পারে?

তবে কি একটা জয়ের আনন্দে আকুল হয়ে চলে গেল সুনয়না?

ফটকের কাছ থেকে সরে আসে; আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ঘরের দিকে ফিরে যায় প্রতিভা। এবং বারান্দার উপর উঠে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই আশ্চর্য হয়ে নিজেরই চোখের উপর হাত বোলায় প্রতিভা। ভিজে গিয়েছে চোখ দুটো। কিন্তু বুঝতে পারে না, কার জন্য এবং কিসের মায়ায় চোখ দুটো সজল হয়ে উঠলো?

কার জন্য দুঃখ হয়? সুনয়নার জন্যই বোধ হয়। কিন্তু নিশীথের মুখটাও মনে পড়ছে কেন? সে বেচারার বুকের ভিতরে কোন বেদনা চিরকালের আক্ষেপ হয়ে লুকিয়ে রইল না তো?

বুঝতে কি আর কিছু বাকি আছে? কেন এসেছিল সুনয়না, এই প্রশ্ন প্রতিভার কাছে এখন আর না-বোঝবার মত কোন রহস্য নয়। কিন্তু সুনয়না যে সেই রহস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, একেবারে ধুলো করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুনয়নার চোখের সেই হাসির ছায়াটা যেন প্রতিভার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই দপ করে হেসে উঠলো আর নিভে গেল। তবে কি প্রতিভারই জীবনের উপর করুণা করেছে সুনয়না?

হয়তো তাই। কিন্তু শুধু তাই নয়। কালিকা মাইনসের ম্যানেজার নিশীথ রায়ের জীবনেরও উপর সুনয়নার মায়া হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠেনি কি? এবং এই মায়া কি নিতান্তই মায়া? কিংবা…

প্রতিভার ভাবনাটা ভুল করেনি বোধ হয়। নিশীথ রায়কে সত্যিই ভালবেসেছে সুনয়না। তা না হলে, নিশীথ রায়ের জীবনের ঘরে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়ে উঠবে কেন সুনয়না? যেখানে আঘাত হানবার সুযোগ ছিল, আঘাত হানা উচিত ছিল, সেখানে সান্ত্বনা দিয়ে আর সাহস দিয়ে, এবং যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল সুনয়না। সুনয়নার মুখটা মনে পড়লে প্রতিভার মাথাটা যে আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে যায়।

কালিকাপুরের শালবনের ছায়াময় কালো চেহারা আর দূরের পাহাড়ের চেহারা হঠাৎ বদলে গিয়েছে মনে হয়। দেখতে পায় সুনয়না, যেন হেসে ঢলঢল করছে চারিদিকের মাঠ, পাহাড় আর শালবন। সন্ধ্যা হতেই পুবের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ নিশ্চয়।

বারান্দার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। বেয়ারাটা এসে সুইচ টিপেছে। প্রতিভার হাতের কাছে একটা চিঠি দিয়ে চলে যায় বেয়ারা।

রাজপোখরার চিঠি; শিবদাসবাবু লিখেছেন। চিঠির লেখা

পড়তে পড়তে প্রতিভার চোখ দুটো আবার জলে ভরে যায়। চিঠির কথাগুলি যেন একটা ছোট ছেলের কান্নাহাসির মত করুণ-মধুর যত কথা। বোঝা যায়, চিঠি লিখতে লিখতে শিবদাস দত্তের চোখ দুটো বার বার কেঁদেছে আর হেসেছে: ভাল আছিস তো, মা? আমার যে এখুনি ছুটে গিয়ে তোকে একবার কোলে নিতে ইচ্ছে করছে।…নিশীথ ভাল আছে তো?…কোন ভাবনা করিস না, প্রতিভা…মানুষের মিথ্যে কথা শেষ পর্যন্ত কারও ক্ষতি করতে পারে না।

চিঠির শেষ লাইনে একটি কথা লিখেছেন, শিবদাস দত্ত, একটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু শিবদাস দত্তের এই আক্ষেপের ভাষা যেন একটা প্রাণখোলা হাসির প্রতিধ্বনি।—শীতলবাবু একটা অদ্ভুত কথা বললেন; বেচারা নিশীথের চরিত্রের নানারকম অপবাদ করে একটা ভয়ানক বাজে চিঠি বিভূতিই লিখেছে। আমি সে চিঠি পড়েছি আর বার বার হেসেছি।

প্রতিভার চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ প্রসন্নতার দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। বিভূতি, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি, লোহার মত কঠিন যার চরিত্রের শুদ্ধতা, সেই ভদ্রলোকই তাহলে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার জীবনকে কলুষের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়েছে!

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। সুইচ টিপে বারান্দার আলো নিভিয়ে দেয়, আর চাঁদের আলোতে ঢলঢল করছে কালিকাপুরের মাঠ পাহাড় আর শালবনের যে শোভা, তারই দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিভূতিকে যে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। জানে না বিভূতি, এখন কল্পনাও করতে পারছে না বিভূতি, প্রতিভার জীবনের কত বড় উপকার সে করে ফেলেছে। বিভূতির চিঠি অলক্তকের উৎসবের আলপনা মুছে দিয়েছিল বলেই না প্রতিভা আজ নিশীথ রায়ের ভালবাসার এই ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

যেন প্রতিভার মুখের ভিতর থেকে হাসিটা বার বার উথলে উঠছে। ভাগ্য ভাল প্রতিভার, প্রতিভাকে ঘৃণা করেছিল বিভূতি। আরও ভাগ্য, নিশীথকেও ঘৃণা করে বিভূতি। তা না হলে, আজ যে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতা এই বাড়ির এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কালিকাপুরের পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে ঢলঢল ঐ শালবন আর পাহাড়ের শোভা দুচোখ ভরে দেখতো।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ। দেখতে পায় প্রতিভা, হ্যাঁ, নিশীথেরই গাড়ি। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলছে না। নিশীথের গাড়িটাও যেন এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আস্তে আস্তে হেসে গড়িয়ে বাড়ি ফিরছে।

বারান্দার উপর উঠে আশ্চর্য হয় নিশীথ। তুমি কি আমার আসতে দেরি দেখে···

প্রতিভা হাসে। না, তোমার আসতে দেরি দেখে ভাবনা করবো, আমি সে মেয়ে নই।

নিশীথও হাসে। এতটা তুচ্ছ কোরো না, প্রতিভা!

নিশীথের কাছে এগিয়ে গিয়ে, নিশীথের গলা দুহাতে জড়িয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা। বাবার চিঠি এসেছে।

—তাই বল। সেজন্য এত খুশি।

—শুধু সেজন্য নয়।

—তবে?

—মনে পড়লো, তোমার বন্ধু বিভূতিবাবু বড় উপকারী মানুষ।

নিশীথ হাসে। হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা আমার একটা উপকার করেছে, স্বীকার করতেই হবে।

—তার মানে?

—বিভূতি তোমাকে ঘেন্না করতে পেরেছিল বলেই না আমি আজ···

প্রতিভার মাথায় হাত বুলিয়ে নিশীথ মুগ্ধ হয়ে বলে,

আজ তোমাকে এখানে চোখের এত কাছে দেখতে পাচ্ছি।

—বিভূতিবাবু কি তোমাকে শ্রদ্ধা করে?

—তা জানি না। তবে অশ্রদ্ধাই বা করবে কেন?

সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই নিশীথের হাতের কাছে শিবদাস দত্তের চিঠিটা এগিয়ে দেয় প্রতিভা।

চিঠি পড়েই হো-হো করে হেসে ওঠে নিশীথ। বিভূতিটার মাথা খারাপ। ···যাই হোক···বিভূতির কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

—কেন?

—বেচারা চেষ্টা করে, শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ের উপকার করবার জন্য এভাবে অলক্তকের উৎসবটা ভেঙে দিতে পেরেছে বলেই তো তোমাকে···

প্রতিভাকে বুকের কাছে টেনে নেয় নিশীথ। আস্তে আস্তে ফিসফিস করে প্রতিভার কানের কাছে যেন জীবনের একটা সৌভাগ্যের আর তৃপ্তির গুঞ্জরণ শোনাতে থাকে, ভালই করেছে বিভূতি।

—একটা কথা···

—কি?

—শীতলবাবুর কাছে তোমার নামে এরকম একটা অপবাদের চিঠি দিয়েও বিভূতিবাবু ফুল উপহার পাঠিয়েছিল কেন?

—ফুল? ও, হ্যাঁ···মনে পড়েছে, একঝুড়ি ফুল পাঠিয়েছিল বিভূতি।

—কেন?

—এটাও বিভূতির একটা অভ্যাস, একটা স্টাইলও বলতে পার। চিরকাল বিভূতিকে তো এইরকম নানা কাণ্ড করতে দেখছি।

—তার মানে?

—তার মানে, বেচারা মিছিমিছি নানারকম কাণ্ড করে ফেলে। যা না করলেও চলে, তাও করে।

—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—যেমন ধর; বি-এস্‌সি পরীক্ষাতে যে কাণ্ডটা করেছিল বিভূতি। পরীক্ষার হলে বসে অমন বেপরোয়া হয়ে, এত বড় একটা বই আলোয়ানের আড়ালে রেখে, গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে... ওভাবে দশ-বারটা নম্বর বেশি পাওয়ার জন্য...না, কোন দরকার ছিল না। তবু...

—এইবার বুঝলাম।

—ওর চাকরিটার কথাই ধর-না কেন। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সাহেবমালিক বিভূতির সেই চমৎকার চালাকিটা ধরতেই পারেনি। নইলে আমাদের ত্রিপুরারি সেনের মত এত যোগ্য ক্যান্‌ডিডেট্‌কে বাদ দিয়ে বিভূতিকে চীফ সুপারভাইজার করবে কেন?

—সেটা আবার কি ব্যাপার?

—ত্রিপুরারি সেনকেই চীফ সুপারভাইজার করা হবে, খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিলিতী মালিকেরা একরকম সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিলেন; বিভূতিও ঐ কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু বিভূতির চেয়ে ত্রিপুরারি দশগুণ বেশি কোয়ালিফায়েড। ঐ কাজ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই বিভূতির পক্ষে ছিল না, কিন্তু বিভূতি দমবার পাত্র নয়। বিভূতি এক পুলিশ অফিসারকে বেশ কিছু টাকা খাইয়ে ত্রিপুরারির নামে একটা খারাপ রিপোর্ট করিয়েছিল যে, ত্রিপুরারি আগে রিভল্যুশনারী দলে ছিল, এবং এখনও হাড়ে-হাড়ে অ্যান্টি-ব্রিটিশ। খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের ডিরেক্টর-বোর্ড এই রিপোর্ট পেয়েই ত্রিপুরারির সম্পর্কে সাবধান হয়ে গেল। কাজটা পেয়ে গেল বিভূতি।

—চমৎকার ব্যাপার।

—টাকা-পয়সার ব্যাপারেও বিভূতির এরকম খেয়াল আছে; যা না করলেও চলে, তাই করবে।

—কি রকম ?

—বিভূতি বেশ বড়লোকের ছেলে। চাকরি-বাকরি না করলেও ওর চলে যাবে, কোন অভাবেই পড়তে হবে না। কিন্তু টাকার ওপর বিভূতির বড় মায়া! কোন চ্যারিটিতে কোনদিন একপয়সা চাঁদা দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, কারও কাছে ধার স্বীকার করেনা বিভূতি।

—তার মানে ?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ। কারও 'কাছ থেকে টাকা বা কোন জিনিষ ধার নিলে সেটা মনেই রাখতে পারেনা বিভূতি; এমনই ভুলো মন। গালুডির চৌহানবাবুর সঙ্গে বিভূতির একবার কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। আলিপুরে একটা বাড়ি কেনবার জন্য সেদিনই পাঁচহাজার টাকা বায়না করবে বলে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়েছিল বিভূতি। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। অগত্যা চৌহান-বাবুর কাছ থেকে নগদ পাঁচহাজার টাকা নিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। চৌহানবাবু কোন রসিদ চাননি, আর বিভূতিও দেয়নি। বাস···তারপর এই তো পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গিয়েছে, বিভূতি এখনও মনে করতে পারছেনা যে, চৌহানবাবুর কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা ধার নিয়েছিল। চৌহানবাবু বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

—আরও চমৎকার ব্যাপার।

—বিভূতির এসব কাণ্ড দেখতে ভাল লাগেনা ঠিকই, এরকম কাণ্ড করা উচিতও নয়, কিন্তু একটি বিষয়ে বিভূতির প্রশংসা না করে পারি না।

—কি ?

—সেটা তুমিও শুনেছ। বিভূতির চরিত্র নিখুঁত; বিভূতি আমার বিশবছরের চেনা বন্ধু; কিন্তু শতমুখে স্বীকার করবো, জীবনে সেরকম কোন ভুল করেনি বিভূতি, যে ভুল···

—কি ?

নিশীথ গম্ভীর হয়, এবং গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে করুণ হয়ে উঠতে থাকে। যে-ভুল আমি করেছি।

প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের তারা দুটো যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে জ্বলে ওঠে। তুমি কোন ভুল করনি, নিশীথ !

—কি বললে ?

—আমিও কোন ভুল করিনি। আমি চেঁচিয়ে গর্ব করে বলছি, নিশীথ, তোমার আমার ঐ ভুলকেও আমি নমস্কার করতে পারি, কিন্তু তোমার বন্ধু বিভূতির চরিত্রকে ঘেন্না করতেও ঘেন্না হয়।

—বিভূতির উপর খুব রাগ করছো বলে মনে হচ্ছে।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার প্রতিভার চোখ দুটো সত্যই রাগ করে ছটফট করতে থাকে। বড় ভুল কথা বললে, নিশীথ।

—অ্যাঁ ?

হেসে ফেলে প্রতিভা ; আর তেমনই ছটফট করে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিশীথের বুকের সঙ্গে আরও নিবিড় হয়ে এলিয়ে পড়ে। বিভূতিকে সত্যই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, নিশীথ। বিভূতি আমার যে উপকার করেছে, তার চেয়ে বড় উপকার হয় না।

—কি ?

—আমাকে বিয়ে করেনি বিভূতি, এর চেয়ে বড় উপকার আমার জীবনে আর কি হতে পারে ? বিভূতি বেচারা আমার মুক্তিদাতা।

সত্যিই যেন মুক্তির আনন্দে উচ্ছল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে প্রতিভা।

নিশীথের নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে, আমাকেও মুক্তি পেতে হবে—

হেসে ওঠে প্রতিভা ; এবং নিশীথও প্রতিভার চমকে-ওঠা বুকের শিহরটুকু অনুভব করতে পারে। নিশীথ বলে, কিন্তু তুমি সেজন্য কিছু ভেব না, প্রতিভা। আমি কাউকে ভয় করি না ; কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রতিভা বলে, আজ সন্ধ্যার একটু আগে সুনয়না এসেছিল।

চমকে ওঠে নিশীথ ; এবং বুঝতে পারে নিশীথ, তার বুকের এই ঢিপঢিপ শব্দ, ভীরুতার এই আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে প্রতিভা।

নিশীথের হাত ধরে প্রতিভা। চল, ঘরের ভেতরে গিয়ে বসি।

ঘরের ভিতরে না গিয়ে, দুপা এগিয়ে গিয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে নিশীথ। চেয়ারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর, যেন বুকের ভিতরের ভীরু নিশ্বাসগুলির সঙ্গে মনে মনে সংগ্রাম করে আরও ক্লান্ত হয়ে যাবার পর, আস্তে একটা হাত তুলে প্রতিভার হাত ধরে নিশীথ। তোমাকে অপমান করেনি তো সুনয়না?

—না।

—আমাকে অপমান করে গিয়েছে বোধ হয়?

—না।

—কেন? আমাকে অপমান করা ছাড়া সুনয়নার তো এখানে আসবার কোন দরকার হতে পারে না।

—তা জানি না।...কিন্তু সুনয়না তোমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেয়ে আসবার নেমন্তন্ন করে গিয়েছে।

—দুঃসাহস!

প্রতিভা হাসে, কা'র দুঃসাহস?

—সুনয়নার ; আমাকে গালুডিতে গিয়ে চা খেতে নেমন্তন্ন করা যে তোমাকে অপমান করা।

—আমাকেও নেমন্তন্ন করেছে সুনয়না।

—সেকি! আশ্চর্য হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ। —তোমাকে নেমন্তন্ন করে কেন? তোমাকে চেনে নাকি সুনয়না?

—হ্যাঁ। সুনয়না যে আমার অনেকদিন আগের চেনা বন্ধু।

—তাই বল, বন্ধু বলেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে নেমন্তন্ন করে ফেলেছে। নইলে…

—কি?

—নইলে আমার সামনে তোমাকে, আর তোমার সামনে আমাকে অপমান না করে খুশি হতোনা সুনয়না।

—সুনয়নাকে এরকম ভয়ানক মানুষ বলে মনে করছো কেন?

—জানি বলেই মনে করছি। তুমি কিছুই জান না।

—কিন্তু আমাকে বন্ধু বলে নেমন্তন্ন করেনি সুনয়না।

—তবে?

—তোমার স্ত্রী বলে।

—অসম্ভব।

—বিশ্বাস কর, নিশীথ! সুনয়না খুব খুশি হয়েছে।

—কিসে খুশি হলো?

—আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে বলে।

—বুঝলাম না, প্রতিভা।

—বুঝতে পারনা কেন নিশীথ? আমাকে যে চেনে জানে, আমার ভুল নিজের চোখে দেখেছে সুনয়না; আমার জন্যে একদিন কেঁদে ফেলেছিল সুনয়না।

বলতে বলতে মাথা হেঁট করে প্রতিভা। এবং প্রতিভার সেই হেঁটমাথা মূর্তির দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিশীথ। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিভার চোখে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ, ছিঃ, প্রতিভা! সেজন্য সুনয়নাকে ভয় করবার কোন দরকার হয় না।

—সুনয়নাকে ভয় করছিনা, নিশীথ। ভয় করছি নিজেকে।

—কেন ?

—সহ্য করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।

যেন প্রতিভার জীবনের পথে একটা অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষার আসন্নতার ছায়া দেখতে পেয়েছে প্রতিভা। সেই পরীক্ষার কাছে পরাভব যেন মানতে না হয়; তারই জন্য প্রাণের ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞার জোর ভরে রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে প্রতিভা।

—কি সহ্য করতে হবে বলে ভাবছো, প্রতিভা ?

—তোমার শুনে কোন লাভ নেই, ক্ষতিও নেই, নিশীথ। জিজ্ঞাসা কোরো না।

—আমি বলতে পারি।

প্রতিভা হাসে। তবে বল।

—ভাবছো, সুনয়না যদি আমাকে আবার···অসম্ভব, প্রতিভা; আমি আত্মহত্যা করতে পারবো, তবু সুনয়নার ছায়ার কাছেও আর দাঁড়াতে পারবো না।

—কিন্তু যদি তুমি বুঝতে পার যে, সুনয়না তোমাকে ভালবাসে ? তবে ?

হেসে ফেলে নিশীথ। যদি পশ্চিমে সূর্য ওঠে, তবে ?··· তোমার প্রশ্নটারই কোন অর্থ হয় না, প্রতিভা। সুনয়নার মত মানুষ ওসবের ধার ধারে না। সুনয়না একটা বেপরোয়া উৎপাত মাত্র। মানুষকে নিজের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দেওয়াই ওর প্রাণের একটা আনন্দ।

প্রতিভা হাসে। কিন্তু যদি সত্যিই সুনয়না তোমাকে ভালবেসেছে বলে তুমি বুঝতে পার, তবে···

—যদি একটা কাল্পনিক ঘটনা বলে সেটা মেনেই নিই, তবু তাতেও কিছু আসে যায় না। নিশীথ রায় সুনয়নাকে কোনদিন ভালবাসেনি, ভালবাসতেও যাবে না। তুমি মিছিমিছি···

—না আমিও সেজন্য ভাবি না। সুনয়না যদি তোমাকে

ভালবাসে, তবে আটকাবে কে? আর সেটা তোমার দোষই বা হবে কেন? কিন্তু…

—আর কিন্তু কেন? কোন কিন্তু নেই।

—যাই হোক; তাহলে গালুডিতে গিয়ে সুনয়নার বাড়িতে চা খেয়ে আসি চল।

—আমি যাব না।

—আমি যাব কি?

—সেটা তোমার ইচ্ছে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, তুমি যাও।

—কিন্তু তুমি না গেলে, শুধু আমি একা গেলে সুনয়নাকে অপমান করা হয়না কি?

—আমার জীবনের মানের উপর কোন দরদ আছে সুনয়নার, যে আমাকে ওর মান অপমানের কথা ভাবতে হবে?

—আছে।

—কি? ভ্রূকুটি করে তাকায় নিশীথ।

—সুনয়না বলতে গেলে আমাদেরই দুজনের কথা ভেবে অনেক কথা বলেছে

—কি কথা?

—তোমার সঙ্গে রোজ বেড়াবার কথা।

—তার মানে?

—হ্যাঁ, সুনয়না একটা ঝি পাঠিয়ে দেবে বলে গিয়েছে; খুব ভাল কাজ জানে ঝিটা; আমাকে কোন ঝঞ্ঝাট সইতে হবে না।

বারান্দার আলো জ্বালিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে নিশীথ। যেন দেখতে চায় নিশীথ, প্রতিভার চোখ দুটো হঠাৎ ঠাট্টার আবেগে হাসছে না তো? নইলে এসব আবোল-তাবোল কথা বলে কি লাভ হচ্ছে প্রতিভার?

প্রতিভা বলে, সুনয়নার ইচ্ছে, এই ঘরের ভেতরে কোন

চেয়ার-টেবিল থাকবে না। এই ঘরটা শুধু তোমার আমার জন্য একটা নিরিবিলি ঘর হবে।

—সুনয়নার এসব কথা বলে লাভ কি?

—সুনয়না তোমার ভাল চায়।

—আমার ভাল চেয়েই বা সুনয়নার লাভ কি?

—সুনয়না তোমাকে ভালবাসে।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় নিশীথ। এবং অনেকক্ষণ পার হয়ে যাবার পরেও যখন কথা বলেনা নিশীথ, তখন প্রতিভাই কথা বলে, তাহলে চল।

—আজ এত রাতে কেমন করে যাব? আজ নয়।

—কবে যাবে?

—একদিন যাওয়া যাবে।

—কিন্তু সুনয়না যাবার সময় বিশেষ একটি অনুরোধ করে গিয়েছে।

—কি?

—যেন কালই আমরা যাই। যেন দেরি না করি।

—কি? নিশীথের চোখ দুটো যেন একটা বিভীষিকার ছায়া দেখে চমকে উঠেছে।

—হ্যাঁ, কালই একবার গালুডি যাবার জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছে সুনয়না, নইলে…

—নইলে কি?

—সে কথা বলেনি সুনয়না।

হাত বাড়িয়ে প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিশীথ, প্রতিভা!

—বল।

—সুনয়না বোধহয়…আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে, প্রতিভা; সুনয়না যেন ভয়ানক কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে—

—কেমন করে বুঝলে ?

—সে মানুষ এরকম ভাষায় কথা বলে না। কোনদিন বলেনি। এ ভাষা সুনয়নার মুখে একেবারে নতুন ভাষা। সুনয়না বোধহয় চিরকালের মত সরে যাবার মতলব করেছে।

—কোথায় সরে যাবে ?

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ, তুমি বড় ভুল করেছ, প্রতিভা।

প্রতিভার মুখ করুণ হয়ে যায়, কি ভুল করলাম ?

—তুমি সুনয়নার কথার অর্থ বুঝতে পারনি। ছি ছি, আমাকে তখনি যদি একবার খবর পাঠাতে !

—তবে কি হতো ?

—তবে সুনয়নাকে আটকে রাখতাম।

—আটকে রেখে কি লাভ হতো ?

—আঃ, একটা মানুষ নিজেকে সহ্য করতে না পেরে প্রাণটারই ইতি করে দিতে চায়, তাকে আটকে রেখে দুটো ভাল কথা বলে, সান্ত্বনা দিয়ে, তাকে তো বুঝিয়ে দিতে পারা যেত যে, না, এরকম হতাশ হতে নেই। সুখী হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার তোমারও আছে।

—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নিশীথ ; সুনয়নার কথা শুনে একটা খটকা লেগেছিল, এই মাত্র।

চুপ করে বাইরের পৃথিবীর জ্যোৎস্নাসিক্ত বিহ্বল শোভার দিকে তাকিয়ে নিশীথের চোখ দুটো যেন ধীরে ধীরে সজল হয়ে উঠতে থাকে। আনমনার মত, যেন ভাঙা-ভাঙা নিঃশ্বাসের বেদনার শব্দ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বরে এক-একটা কথা বলে নিশীথ। রাত হয়ে গিয়েছে···কিন্তু এখনই একবার···এমন কিছু দূর নয় গালুডি— গেলে ভাল হতো।

হঠাৎ প্রতিভার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে নিশীথ। ওকি ! তুমি আবার একি কাণ্ড করেছো, প্রতিভা ?

দেখেছে নিশীথ, এক হাতে কপাল টিপে চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে প্রতিভা। আর, দু'চোখের দুই কোণে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা টলমল করছে।

প্রতিভা হাসে। ঠিক আছে। তুমি যা বলছো, সবই শুনছি; সব সহ্য করতে পারছি; তুমি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবে না।

—তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেলে?

—না। মানুষের জন্য মানুষের মনে মায়া থাকবে, এতে আশ্চর্য হবো কেন, সহ্য করতেই বা পারবো না কেন?

—আমার সত্যিই যে বড় কষ্ট হচ্ছে, প্রতিভা!

—সুনয়নার জন্য নিশ্চয়।

—হ্যাঁ।

—আমারও কষ্ট হচ্ছে, নিশীথ, বিশ্বাস কর।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝলেনা তো?

—একটুও না। তোমাকে ভাল করে চিনতে পারলাম।

—তাই কি কষ্ট পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে সন্দেহ হয়।

—না, সন্দেহ নয়। তোমাকে বিশ্বাস করি।

—কি?

—সুনয়নাকে আজ ভাবতে তোমার ভাল লাগছে।

—সত্যি কথা। মনে হচ্ছে, সুনয়নার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে, সুনয়নাকে ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতে পারছি, সুনয়নার অনেক ক্ষতি করেছি। সুনয়না সুখী না হলে আমি...আমরা সুখী হতে পারবো কিনা, বুঝতে পারছি না, প্রতিভা।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভার চোখ দুটো ক্ষীণ দীপের শিখার মত করুণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলে।

জীবনের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষাটাকে সহ্য করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে প্রতিভা।

এগিয়ে এসে প্রতিভার কাঁধের উপর মাথার ভার এলিয়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে নিশীথ। তোমার কাছেই পরামর্শ চাইছি, প্রতিভা। একটা উপায় বলে দাও।

—এই রাতটা কেটে যাক, তারপর চল, গালুডি যাই।

—কিন্তু গালুডি গিয়ে যদি দেখতে পাই যে···, না, সেরকম কিছু ঘটে যাবে না, কি বল, প্রতিভা? সুনয়না নিজেই যখন কালকে যেতে বলেছে, তখন সুনয়নাকে বিশ্বাস করা যায়, নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষায় থাকবে সুনয়না।

—আমার তো তাই মনে হয়।

নিশীথের মাথায় হাত বোলায় প্রতিভা। নিশীথকে এভাবে আশ্বস্ত করবার অর্থ কি, বোধহয় নিজেও বুঝতে পারেনা প্রতিভা। শুধু বুঝতে পারে যে, নিশীথকে আশ্বস্ত করবার মত জোর আছে প্রতিভার প্রাণে, এবং হাতদুটোও অভিমানের বেদনায় দুর্বল হয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ পরে নিশীথের দিকে একবার তাকায়, এবং তাকাতে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারেনা প্রতিভা। একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছে নিশীথ, যেন অনেক দূরের কোন মায়ার জগতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আর বুঝতে কোন অসুবিধা নেই প্রতিভার, যাকে ভয় করতো তাকেই আজ মায়া করতে চায় নিশীথের মন। যাকে এতকাল ঘৃণা করে এসেছে, তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভুল করছে কি নিশীথ? ভুল নয়, একটুও ভুল নয়। যদি এটা ভুল হয়ে থাকে তবে এটা মানুষেরই মনের ভুল। এরকম ভুল না করলেই বোধহয় মানুষে অমানুষ হয়ে যায়।

ঠিকই তো; প্রতিভার মনটা যে নীরবে প্রশ্ন করে করে নিজের মনের কাছ থেকেই উত্তর আদায় করতে থাকে। আজ সুনয়নার

কথা ভাবতে গিয়ে যদি হো-হো করে হেসে উঠতো নিশীথ, তবে নিশীথকে একটা নিষ্ঠুর হাসির হৃদয়হীন অভিনেতার মত মনে হতো নাকি? এবং, নিশীথের সেই হাসির শব্দ শুনে প্রতিভারই বুকের ভিতরটা ভয় পেয়ে চমকে উঠতো নাকি ?

তাই এইটুকু বুঝতে পারছে বলেই নিশীথের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে প্রতিভার হাতটা একটুও ব্যথিত না হয়ে বরং খুশিই হয়ে ওঠে। এটা কোন পরীক্ষা নয়।

কাল সকালে সুনয়নার চোখের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াবে নিশীথ, তখন. এবং তার পর যা হবে, তারই ছবি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে প্রতিভা ; এবং বুঝতে পারছে, সেটাই তো পরীক্ষা। সহ্য করতে পারা যাবে কি ?

পারা যাবেনা বোধহয়, এবং সেজন্য দুঃখ নেই।

জানবে সুনয়না, নিশীথের মন সুনয়নাকে আজ শ্রদ্ধা করে ; সুনয়নাকে ভাল লেগেছে নিশীথের ; সুনয়নাকে মহৎ বলে মনে হয়েছে নিশীথের। সুনয়নাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে নিশীথের ব্যথিত মুখটা আবেদনময় হয়ে উঠবে। তুমি কোন দুঃখে আর কেন নিজেকে ঘেন্না করবে, সুনয়না ? তোমারও বেঁচে থাকবার সব অধিকার আছে।

সুনয়নাও আশ্বস্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে। এবং তার পর ? নিশীথ ও সুনয়নার এই ক্ষমাময় নতুন সম্পর্কের পাশে একটা অবান্তর ছায়ার মত প্রতিভা যদি পড়ে থাকে, তবে এই দুই বেচারার জীবনের আনন্দে বিড়ম্বনা ঘটানো হয় নাকি ?

মনে মনে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, যেন মনেরই একটা দুরন্ত ব্যাকুলতায় হঠাৎ ছটফট করে উঠেই মুখ ফিরিয়ে নেয় ; চোখ ভিজে গিয়েছে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদ্ভুত একটা প্রতিজ্ঞার হাসি ঢলঢল করতে থাকে ; চাঁদের আলোতে ঢলঢল শাল-বনের শোভার চেয়েও মধুর ও মায়াময় সেই হাসি।

নিশীথের জন্য চা তৈরি করতে হবে ; ব্যস্ত হয়ে ওঠবার আগে

প্রতিভা শুধু মনে মনে একটা প্রার্থনা সেরে নেয়। যেন মনের এই হাসির জোরটা কাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

কালিকাপুর থেকে গালুডি; সকালবেলার রোদ, শালবনের হাওয়া আর সড়কের লাল ধুলোর সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি আর ছুটোছুটির খেলার মত একটা খেলার আবেগে দৌড়তে থাকে নিশীথের গাড়ি। সড়কের একটা বাঁক ঘোরবার সময় স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে, এবং সাবধান হয় নিশীথ। হঠাৎ বড় বেশি আনমনা হয়ে গিয়েছিল নিশীথ, এবং গাড়ির স্পীড একটুও কমিয়ে না দিয়ে একেবারে বাঁকের কাছে চলে এসেছিল। এবং আর একটু ভুল হলেই, স্টিয়ারিং ঘোরাতে আর একটু দেরি করলেই…। না, খুব বেঁচে গিয়েছে গাড়িটা, তেঁতুলগাছটার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আর সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলে গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা চুরমার হয়ে যেত।

গাড়ির সামনের সীটে নিশীথেরই পাশে বসে ছিল প্রতিভা। গাড়িটার স্পীডের মাথায় বাঁক ঘোরবার সময় প্রতিভার শান্ত চেহারাটা নিশীথের গায়ের উপর আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমাটাও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

নিশীথ লজ্জিতভাবে হাসে। গাড়িটা খুব বেঁচে গিয়েছে, প্রতিভা। আর একটু ভুল হলেই…

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিভাও হাসে। আমার চশমাটাও বেঁচে গিয়েছে।

গাড়ির স্পীড মৃদু করে দিয়ে নিশীথ রায় যেন উদাসভাবে সামনের আকাশের দিকে তাকায়। আর, প্রতিভা চোখের উপর চশমাটাকে চেপে দিয়ে পাশের শালবনের দিকে তাকায়।

দুজনেরই প্রাণ যেন ইচ্ছে করে একটা পরিণাম ভুলে যাবার জন্য চেষ্টা করছে। দুজনেই ভুলে গিয়েছে যে, শুধু গাড়িটা আর

চশমাটা নয়, নিশীথ আর প্রতিভার প্রাণ-দুটোও চুরমার হয়ে যেত, যদি আরও একটু বেশিরকমের আনমনা হয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ভুলে যেত নিশীথ। কিন্তু সেটা যেন দুর্ঘটনা হতো না; হঠাৎ খেয়ালের আত্মহত্যার মত সে দুর্ঘটনা যেন বেঁচে যাওয়ার মত একটা সুন্দর পরিণাম হয়ে উঠতো। তাহলে আর এইভাবে, এমন সুন্দর একটা সকালবেলার আলো-ছায়া, পাখির ডাকের শব্দ আর শালবনের হাওয়ার ভিতর দিয়ে ছুটে-ছুটে একটা অগ্নিময় পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হতো না। অদৃষ্টের যত জটিল প্রশ্নের জ্বালা বরণ করবার জন্য, আর পাগল হয়ে যাওয়ার মত একটা বিপদের দিকে এরকম অসহায় হয়ে দৌড়তে হতো না।

না, আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার, এবং সামনের আকাশের দিকে কিংবা পাশের শালবনের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার হয়নি। রেললাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা যখন আরও মন্থর হয়ে বাঁ-দিকের পথে ঘুরে যায়, তখন একটি বাঙলো-বাড়ির ফটকের দু'পাশের দুটি দেওদারের প্রকাণ্ড রৌদ্রাক্ত চেহারাও চোখে পড়ে যায়।

বাঙলো-বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা থামে। আর, নিশীথ ও প্রতিভা যেন একটা নতুন বিস্ময়ের ভারে হঠাৎ অনড় হয়ে শুধু চোখ মেলে দেখতে থাকে, বাঙলো-বাড়ির বারান্দার উপরে যেন দুটি নতুন ধরনের সুখী মানুষ গায়ে-গায়ে মেশামেশি হয়ে আর হাসা-হাসি করে···

কি করছে ওরা দুজন ? ধীরেন আর সুনয়না ?

একটা টেবিলের কাছে চেয়ারের উপর বসে আছে ধীরেন। টেবিলের উপর একটা কাগজ। পেন্সিল হাতে নিয়ে কাগজের উপর কি যেন লিখছে ধীরেন। আর সুনয়না ধীরেনেরই চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টেবিলের সেই কাগজটার কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে

কথা বলছে। কে জানে, কোন স্বপ্নের আর কোন আহ্লাদের জমা-খরচের হিসেব করছে ওরা দুজন?

নিশীথের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার ছেড়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় ধীরেন; আর, সুনয়না যেন একটা প্রবল খুশির ফোয়ারার মত হেসে ওঠে। কি আশ্চর্য, সত্যিই তুমি আশ্চর্য করে দিলে, প্রতিভা।

ধীরেন বলে—কী সৌভাগ্য; আমিও ভাবতে পারিনি, নিশীথ-বাবু, আপনি নিজেই কষ্ট করে একেবারে মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে···

গাড়ি থেকে নেমে নিশীথ আর প্রতিভা এগিয়ে আসে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে যেন এই নতুন বিস্ময়ের কুহক সহ্য করতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে নিশীথ। তার মানে?

নিশীথের প্রশ্নটা যেন একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের গুঞ্জন! গালুডির এই বাঙলো-বাড়ির জীবনটা এ কোন ছদ্মবেশ ধরে নতুন রকমের সৌজন্য সমাদর আর প্রীতির অভিনয় শুরু করে দিয়েছে? এত হাসে কেন ওরা? এত খুশি কেন ওরা?

ধীরেন বলে, আমাদের উচিত ছিল, একদিন গিয়ে আপনাদের দুজনকে এখানে এনে, অন্তত একটু চা খেয়ে যাবার জন্য—

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুনয়না। থাম, থাম তুমি, ভদ্রতা করতে গিয়ে আমাকে বিপদে ফেলছো।

—কেন?

—আমি যে কালই কালিকাপুরে গিয়ে প্রতিভাকে আর নিশীথ-বাবুকে নেমন্তন্ন করে এসেছি।

—তাই বল।

নিশীথ হাসতে চেষ্টা করে। তার মানে, নেমন্তন্ন না করলে আমরা আসতাম না?

সুনয়না হাসে। নিশ্চয় আসতেন না।···তা ছাড়া···

—কি?

—নেমন্তন্ন করেও একটা ভয় ছিল।

—তার মানে ?

—অর্থাৎ, প্রতিভা আসতে পারে বলে মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু আপনি আসবেন বলে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

নিশীথ বোধহয় আবার আরও কিছুক্ষণ আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু ধীরেনের একটা উল্লাসের ভাষা শুনে চমকে ওঠে, আর ধীরেনেরই মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ধীরেন বলে, আর এখানে নয়, নিশীথবাবু।

—কি ?

—এই বাড়ি বেচে দিলাম। চৌহানবাবুই কিনে নিলেন। কালকেই বিক্রি রেজিস্টারি করা হবে।

নীরব হয়ে, আর চোখ দুটো অপলক করে, যেন প্রচণ্ড একটা কৌতূহলের তোলপাড় শব্দ বুকের ভিতরে সামলে রেখে শুনতে থাকে নিশীথ, গালুডির ধীরেনবাবু যেন তাঁর জীবনের এক পরম জয়ের তৃপ্তি, গান করে শুনিয়ে চলেছেন।

—চৌহানবাবু বাবু দর দিয়েছেন মোট ছত্রিশ হাজার টাকা। আমিও তাইতেই রাজী ; এতেই আমার সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হাতে থেকে যাবে।...বাস্, ওতেই হয়ে যাবে।... আপনি তো জানেন, একটা কোয়ারি আমার লীজ নেওয়া আছে।... সেখানে আপনিও তো একবার গিয়েছিলেন, কিসের সাল্‌ফেট না কার্বনেট খুঁজতে...হ্যাঁ, সেই গাঁয়ে, সেই করমপুরাতে গিয়ে থাকবো। কিস্তিতে একটা ট্রাক কিনে নেব। তার পর, একটা বছর খেটেখুটে দু-চারটে ভাল অর্ডার যদি সাপ্লাই করতে পারি, তবে আর কি ? ট্রাকের কিস্তি শোধ করে দেব, আর কারবারটাও মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায়।...প্রফিট ? মাসে শ-দুই টাকা হলেই, হয়ে গেল। তারপর...তারপর সুনয়নার হাত। যদি রোজ মুর্গী-ভাত

খাওয়াতে পারে সুনয়না, তবে তাই খাব। যদি, ভাজা-নিমপাতা, জংলা-কুলের অম্বল আর ডাল-ভাত খাওয়ায় সুনয়না, তবে তাই খাব।...হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার টাকাগুলো দিতে খুবই দেরি হয়ে গেল যদিও...সুনয়না বললে মোট এগারো হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে...এইবার সে টাকাটা আপনাকে অনায়াসে দিয়ে দিতে পারবো।

হো-হো করে হেসে ওঠে ধীরেন। সুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে যেন একটা অদ্ভুত লাজুক-হাসি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিভার সোনার ফ্রেমের চশমার কাচও যেন ঝিক ঝিক করে হাসে। আর, নিশীথ রায়ের চোখদুটো চিকচিক করতে করতে হঠাৎ একেবারে যেন মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিভা বলে, চা খাওয়াবার যে নামও করছো না, সুনয়না? তোমার মতলব কি?

—মতলব হলো, শুধু চা খাইয়ে ছাড়বো না। দুপুর না হবার আগে যেতে পারবে না, আর ভাত খেয়ে যেতে হবে।

ধীরেন বলে, আমি তাহলে এখনই একবার বাজার ঘুরে আসি। থলিটা দাও, সুনয়না।

প্রতিভা হাসছে; প্রতিভার জীবনের যত ভয় অভিমান আর উদ্বেগ কি একেবারে মিথ্যে হয়ে আর শূন্য হয়ে চৈতী ঝড়ের ধুলোর মত উধাও হয়ে গেল? প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয় নিশীথ। প্রতিভা যেন সেইসব অদ্ভুত গল্পের নায়িকার মত, যারা পরীক্ষার জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠো করে ধরতে একটুও ভয় পায় না, এবং পরীক্ষায় জয়ী হয়ে নিজেরই দুঃসাহসিক হাতটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে, হাতে একটা ফোস্কাও পড়েনি, কোন জ্বালা জ্বলে না।

ধীরেনবাবু হাসছেন। এই ভদ্রলোকের জীবনটাও যে জয়ের গর্বে হাসছে বলে মনে হয়। সুনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে করমপুরা নামে এক জংলা গাঁয়ে থাকবেন, আর সুনয়নার হাতের রান্না ডাল-ভাত

খেয়ে ধন্য হয়ে যাবেন। পরশপাথরের মত কি যেন একটা বস্তু, কী চমৎকার স্বপ্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন ভদ্রলোক।

সুনয়নাও হাসছে। বর্ষার জলে ধোয়া হয়ে গায়ে আবার নতুন রোদ লাগিয়ে যেমন ঝলমল করে হেসে ওঠে শালবন, সেইরকম ঝলমলে সুখী হাসি। সুনয়নার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজেরই চোখের চেহারাটা কল্পনা করতে পারে নিশীথ। নিশীথের চোখ ছাপিয়ে যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তি উথলে উঠছে। হেসে হেসে প্রতিভার সঙ্গে কথা বলছে যে-সুনয়না, তার মুখের দিকে তাকাতে নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি এত তৃপ্ত হয়ে যাবে, এ-যে নিশীথ রায়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিশীথের চোখ দুটো যে সুনয়নার মুখের দিকে একটা সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের মত তাকিয়ে আছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ। বাঃ, খুব কাণ্ড করলেন আপনারা!

—জাঁকিয়ে সুখের সংসার করতে দুজনে করমপুরাতে চললেন; এদিকে কালিকাপুরের অবস্থা যে কাহিল।

—কি হলো?

প্রতিভা বলে, রান্না করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমাকে রান্না করতে দেখলে ভদ্রলোক হেসে হেসে...

—প্রতিভার রান্নাবান্নার রকম যদি আপনি দেখতেন, তবে আপনিও হাসতেন। বেগুন ভাজতে গিয়ে আগে কড়াতে বেগুন ছাড়ে, তারপর তেল।

সুনয়না হাসে। কি আর করবে বেচারা? ওসব কাজের ধার ধারেনি কখনো, কিছু শেখেওনি; আর, বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, রান্না করবার একটা লোকও পাওয়া যাবেনা, এমন একটা জায়গাতে এসে ওকে থাকতে হবে।

—তাহলে, আমারই অপরাধ?

ধীরেন বলে, কোন চিন্তা করতে হবে না। চৌহানবাবুর বাড়িতে রান্না করে যে পাঁড়ে, তার ভাইটাও ভাল রান্নাবান্না জানে। আমি

ওকে ঠিক করে দিচ্ছি। মাইনে পঁচিশটাকা, খাওয়া; আর বছরে একজোড়া ধুতি আর একজোড়া গামছা।

—একটা ঝি-এর কথা বলেছিলাম, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—করমপুরা যাবার আগেই আমি সেই ঝি-টাকে তোমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

—না, এবার এককাপ চা না হলে আর···

—এখনি হয়ে যাবে···এস, প্রতিভা।

—আমি বাজার ঘুরে আসি, কেমন?

—এস।

—আমি একবার চট করে ঘাটশিলা ঘুরে আসি।

প্রতিভা রাগ করে তাকায়। ঘাটশিলাতে আবার কিসের কাজ?

—ঠিক কাজ নয়, একটা অনুরোধ রাখবার কাজ। যাবো, শুধু আধঘণ্টা থাকবো, আর ফিরে আসবো।

সুনয়না হাসে। যান যান। কোন ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুস খেয়ে আসবেন না. তাহলেই হবে।

নিশীথও হাসে। ঘুস খাওয়ার মত চরিত্রের জোর যদি থাকতো তবে তো খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির মত এতদিনে প্রায় লাখ-খানেক টাকা···থাকগে ওসব বাজে কথা।

ঘাটশিলাতে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে যে-কাজটা সেরে দিয়ে চলে আসবে বলে মনে করেছে নিশীথ, সেটা সত্যিই কোন কাজ নয়। কালিকা-মাইনসের স্টোরবাবু রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবুর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ। রমেশ বার বার অনুনয় করে বলে গিয়েছে, একবার দয়া করে গরীবের বাড়িতে যাবেন স্যার।

রমেশের বাড়ি ঘাটশিলা, চাকরি করে কালিকাপুরে। রমেশের বাড়ির যা অবস্থা, এবং পৈতৃক সম্পত্তি বলতে যা আছে, তাতে

রমেশের চাকরি করবার কোন দরকারই ছিল না। তবু চাকরি করে রমেশ। এবং, নিশীথ জানে, চল্লিশ টাকা মাইনে পেয়েই স্টোরবাবু রমেশ খুশি; ধূর্ত ঠিকাদারগুলো রমেশকে খুশি করবার জন্য কতবার সেধেছে, কিন্তু রমেশ শুধু ঠিকাদারগুলোকে মুখ খুলে গালাগালি দিয়ে খুশি হয়েছে। একটাও অন্যায় পয়সা স্পর্শ করে না রমেশ। তাই বোধহয় রমেশকে একটু বেশি পছন্দ করে নিশীথ।

ঘাটশিলা যাবার পথে গাড়িটা উদ্দাম হয়ে ছুটতে থাকে, কিন্তু নিশীথ রায়ের হাত আর কোন ভুল করে না। অনেক কথা মনের ভিতরে তোলপাড় করতে থাকলেও আনমনা হয়ে যায় না। এবং, কেন যেন বার বার বিভূতির কথাই মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে, বিভূতির চরিত্রের বেশ সুনাম আছে। বিভূতির সেই চরিত্রের খ্যাতি জেঠামশাই পর্যন্ত শুনেছেন; বিশ্বসুদ্ধ মানুষই বোধহয় শুনেছে।

বিভূতির সঙ্গে একদিন তো দেখা হবেই। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, আর মনে মনে একটা অস্বস্তির হাসিও হেসে ফেলে নিশীথ। নিশীথের পাশে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে বেচারা বিভূতির চোখ দুটো বোধহয় শিউরে উঠবে। নিশীথকেও একটা ঘৃণার জীব বলে মনে করবে; মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর কোন কথা না বলেই চলে যাবে। নিশীথের জীবনকে একটা অশুচি বিভীষিকার বিলাস বলে মনে করবে, কিংবা মনে মনে ঠাট্টা করে একটা ধিক্কারের হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে বিভূতি। বাঃ, বেশ হয়েছে। যেমন 'দেবা' তেমনই 'দেবী'। নিশীথের মত মানুষের সঙ্গে প্রতিভার মত নারী-কেই মানায়। না প্রতিভা, না নিশীথ, দুজনের কেউই পৃথিবীর কোন শুচিতাময় জীবনের মানুষকে ঠকাবার সুযোগ পেল না; সাধ্যই হলো না। বেশ ভাল হলো। ভাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ত-তার হাঁপ ছাড়বে বিভূতি

চরিত্রহীন মানুষের প্রতি বিভূতির ঘৃণা যেমন ভয়ানক, চরিত্রশীল মানুষের প্রতি বিভূতির মায়াও তেমনই ভয়ানক। আজও মনে

করতে পারে নিশীথ, নিরীহ ও নির্দোষ চরিত্রের মানুষকে আরও কতবার এইভাবে রক্ষা করেছে বিভূতি। কলেজের ছাত্র ছিল যখন বিভূতি, তখন ইংলিশের লেকচারার অমিয়বাবুকে ঠিক এইরকম একটা ভয় থেকে রক্ষা করেছিল। মঞ্জু নামে থার্ড ইয়ারের যে ছাত্রীটির সঙ্গে অমিয়বাবুর বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি হয়েছিল, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই ছাত্রীটির জীবনের কয়েকটা আশ্চর্য-রকমের গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি ; এবং অমিয়বাবুকে জানিয়েও দিয়েছিল। একটিও মিথ্যেকথা বলেনি বিভূতি। ঐ মঞ্জু নামে ছাত্রীটি বছর চারেক আগে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, এবং প্রায় একবছর পরে বাড়ি ফিরেছিল। ঘটনাটা হলো কানপুরের। কি আশ্চর্য, প্রায় চার-পাঁচ বছর আগের সেই কানপুরের একটা ঘটনার বৃত্তান্ত কল-কাতাতে বসেই যোগাড় করতে পেরেছিল বিভূতি।

নিশীথ এবং আরও কেউ-কেউ বিভূতিকে একটু অনুযোগও করেছিল, এসব ব্যাপারে তোমার এত ইন্টারেস্ট না থাকাই ভাল, বিভূতি। একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমার যে কি লাভ…

বিভূতি বলেছিল, সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই। বেচারা অমিয়বাবুর কাছেও তো আমার একটা কর্তব্য আছে। অমিয়বাবুর মত একজন শুদ্ধ ও সজ্জন মানুষের স্ত্রী হবে মঞ্জু নামে এরকম একটা…এক্সকিউজ মি, নিশীথ—

বন্ধুরা বলেছিল, কিন্তু তুমি তো আর চিরকাল মঞ্জুর বিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আজ না হোক, কাল, অমিয়বাবু না হোক, অন্য কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে হয়ে যাবেই।

—হ্যাঁ, হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমি সে-খবরও কোনদিন পাই, যেদিনই পাই না কেন, তখন একবার দেখে নেব।

—অ্যাঁ! নিশীথ এবং আরও কোন-কোন বন্ধু আতঙ্কিতের মত চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল।

—হ্যাঁ, চরিত্রের ক্ষত লুকিয়ে, আর একটা সজ্জন মানুষের বিশ্বাসে ফাঁকি দিয়ে যদি কোন মানুষ বিয়ে করে ফেলে, তবেই বা তাকে ক্ষমা করবো কেন ?

—কি করবে তুমি ?

—জানিয়ে দেব। স্বামী কিংবা স্ত্রী, যে বেচারা ঠকবে, তাকে সব খবর জানিয়ে দেব।

—স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মিছিমিছি একটা অশান্তি এনে দেবে ?

—এরকম অশান্তি হওয়াই যে ভাল। ওটা প্রায়শ্চিত্ত, এবং ওতে ফল ভালই হবে।

—ফল ভাল হবে কেমন করে ?

—হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, নয় ভালবাসা ভেঙে যাবে।

নিশীথ ভয় পেয়েছিল। তোমার মনটা তোমার চরিত্রের মতই শক্ত।

বিভূতির চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। আমি তাই চাই। এবং এখানেই বোধহয় তোমার ও আমার প্রভেদ !

সেদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু রাগ করতে পারেনি নিশীথ। এবং আজও ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় ; আজও যে রাগ হচ্ছে না। বেচারা বিভূতির মনটা এমন কঠোর বলেই তো প্রতিভাকে আজ বুকের কাছে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে নিশীথের। আঃ, সারাটা রাত কেমন নিঝুম হয়ে নিশীথের বুকের কাছে মাথা গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে রইল প্রতিভা ; যেন কত শত বছরের একটা চেনা আশ্রয়ের শান্তি তৃপ্তি আর নিবিড়তার মধ্যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনটা সঁপে দিয়েছে প্রতিভা। বার বার তিনবার প্রতিভার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ।

আজ বিভূতির সঙ্গে যদি একবার ধীরেনবাবু আর সুনয়নার দেখা হয়ে যায় ? নিশীথের বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন এক বিপুল কৌতুকের আবেগে নেচে ওঠে। হেসে ফেলে নিশীথ। দেখে লজ্জিত

হবে কি বিভূতি? কিংবা আশ্চর্য হবে? সুনয়নাকে সত্যিই বাঁচিয়ে দিয়েছে বিভূতির চিঠির সেইসব অভিশাপময় অভিযোগ। সুনয়নার অদৃষ্ট যে একটা পুণ্যস্নান সেরে নিয়ে ধীরেনবাবুর জীবনে নতুন আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে। বাঃ, বেশ করেছে বিভূতি। মনে হয়, থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী সেই মঞ্জুর জীবনও এখন তার স্বামীর ভালবাসার সাথী হয়ে এইরকম একটি মহুয়া-বনের স্নিগ্ধ ছায়ার পাশে…

হ্যাঁ, স্টোরবাবু রমেশের বাড়িটা দেখা যায়। সড়কের দু'পাশে এই ছোট ছোট দুটো মহুয়াগাছের ছায়া পার হয়ে গেলেই রমেশের বাড়ির বাগানের কাছে পৌঁছে যাবে নিশীথের গাড়ি।

কী কাণ্ড করেছে রমেশ! সারা বাগান জুড়ে কতবড় একটা মণ্ডপ। মণ্ডপের সোনালী ঝালর বাতাসে উড়ছে আর চিকচিক করছে। রমেশের বাবার শ্রাদ্ধবাসর, যেন একটা মহামেলা কিংবা মহোৎসবের আসর। মণ্ডপের প্রবেশপথে সত্যিকারের দুটি সোনার কলস রাখা হয়েছে; তার উপর আম্রপল্লব আর নারকেল। বাগানের পশ্চিম দিকের একটা ময়দান, গাড়িব পার্কিং-এর জন্য খড়ি দিয়ে দাগিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক গাড়ি এসেছে। আসবেই তো, রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবু বলতে গেলে একজন দিগ্বিজয়ী কনট্রাক্টর ছিলেন। এবং টাটানগর ও তার আশ-পাশের যে-কোন গণ্যমান্য ও সজ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এক টাটানগরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা একশতেরও বেশি। এই কথা রমেশের কাছেই শুনেছিল নিশীথ।

রমেশও এসে এবং হেসে হেসে বিনীতভাবে বলে, আমি ঠিকই বলেছিলাম, স্যার। টাটানগর থেকে ঠিক একশত জন রেস্‌পেক্টেব্‌ল্‌ এসেছেন। সবসুদ্ধ গাড়ি এসেছে ত্রিশের ওপর। ওঁরা যে বাবাকে বড় ভালবাসতেন, স্যার!

মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় নিশীথ, হাজারেরও বেশি নিমন্ত্রিত সজ্জন বসে আছেন। রমেশ বলে, এখন শুধু কীর্তন;

বেলা দুটো পর্যন্ত কীর্তন চলবে। বিকেলে ভাগবত-পাঠ। আর সন্ধ্যার পরেই যাত্রা…'বিল্বমঙ্গল' গাওয়া হবে। খুব ভাল যাত্রা-পার্টি আনিয়েছি, স্যার।

নিশীথ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, এবার আমি চলি রমেশ।

রমেশ অনুনয় করে, কিছুক্ষণ থেকে যান, স্যার!

রমেশের অনুনয়ের বিনিময়ে আর একবার হেসে শুধু বলতে হবে, না, উপায় নেই, রমেশ। আমাকে এখনি গালুডি ফিরতে হবে। এই সামান্য কয়েকটা কথা বলে অনায়াসে এই মুহূর্তে আবার গালুডির দিকে ছুটতে পারত নিশীথ; কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়ে দূরের ভিড়ের একদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে নিশীথ, জেঠামশাই এসেছেন দেখছি—

হ্যাঁ, রমেশের বাবার বন্ধু ডাক্তার হরদয়ালবাবুও সাকৃচি থেকে এসেছেন, এবং নিশীথকে দেখতে পেয়েই নিশীথের দিকে এগিয়ে আসছেন।

—আপনি তাহলে একটু বসুন, স্যার, আমি অন্যদিকের ডিউটিগুলি একটি একটি করে…

—হ্যাঁ।

চলে যায় রমেশ; এবং জেঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নিশীথের কাছে দাঁড়ান। তারপরে আসরের একদিকে চেয়ারের উপর প্রায় গড়িয়ে পড়ে থাকা প্রকাণ্ড-চেহারার এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বিড়বিড় করেন, ঐ যে হাসছে, ঐ যে প্রকাণ্ড-চেহারা ভদ্রলোক, বুকে সোনার চেন ঝুলছে, ঐ ভদ্রলোক হল রাজপোখরার সেই অভদ্রটার কুটুম।

নিশীথ হাসে, তাতে আপনার কি? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?

—হ্যাঁ…বিরক্ত হবার কোন দরকার ছিল না; কিন্তু সত্যিই

বিরক্তি বোধ করছি। লোকটা আবার চেঁচিয়ে ভাগ্নীর বিয়ের কথা বলে লেকচার দিচ্ছে।

—কে ওঁর ভাগ্নী?

—ঐ তো…শীতল সরকারের মেয়েই তো ওর ভাগ্নী। শীতল সরকারের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এইমাত্র উনি খরসোয়ান থেকে ফিরছেন।…যাকগে, এসব কথার সঙ্গে আমাদের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই…প্রতিভা কেমন আছে?…শিবদাসবাবুর চিঠি পেয়েছ?

নিশীথ মাথা নাড়ে। প্রতিভা ভাল আছে, এবং শিবদাসবাবুর চিঠি প্রায় রোজই আসে। জেঠামশাই ব্যস্তভাবে বলেন, আমি এখনই টাটা ফিরবো, নিশি।…তুই কি এখন…

—আমি এখন গালুডি যাব।

চলে গেলেন জেঠামশাই, এবং নিশীথ যেন একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনবার লোভ সামলাতে না পেরে, আস্তে আস্তে হেঁটে, আসরের যত চেয়ারের এক একটা সারি পার হয়ে সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোকেরই কাছে একটি চেয়ারের উপর এসে বসে।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা, সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক তাঁরই পাশের চেয়ারে আসীন, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

—যাক, শেষপর্যন্ত পাত্রকে রাজী করাতে পেরেছি। এক কথায় কি ওরকমের একটা জাঁদরেল পাত্র রাজী হয়, মশাই?

—পাত্র মশাই কি করেন?

—খরসোয়ান-ম্যাঙ্গানিজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। যেমন শিক্ষিত, তেমনই কঠোর চরিত্র।

—তার মানে?

—তার মানে, আজকাল এরকম খাঁটি চরিত্রের ইয়ং-ম্যান আপনি ভূভারতে পাবেনই না। সেই জন্যেই তো প্রায় হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে।

—বুঝলাম না।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান শীতল সরকারের মেয়ের মামা, প্রকাণ্ডকায় সেই ভদ্রলোক। বুকের সোনার চেনে হাত বুলিয়ে নিয়ে নিশীথের দিকে একবার সন্দিগ্ধভাবে তাকান। তারপর নিশীথকেই প্রশ্ন করেন, মশাই-এর কি কোন্ অসুবিধা হচ্ছে?

—কেন?

—আমরা একটা প্রাইভেট বিষয়ে আলোচনা করছি বলে?

—না

এইবার নিশীথের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক। হ্যাঁ...কি বলছিলেন? কেন পাত্রকে হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে?

—হ্যাঁ।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা গলার স্বর মৃদু করে ফেলেন। —আপনার কাছে খুলে বলতে আপত্তি নেই। একটা সমস্যা ছিল...অর্থাৎ ভাগ্নীটি এক চরিত্রহীন যুবকের সঙ্গে প্রেম করে বসেছিল।

—এ তো ভাল কথা নয়—

—ভাগ্নীর কোন দোষ নেই। বেচারী জানতই না যে, ছেলেটির চরিত্রে দোষ আছে।

—যাই হোক, না জেনে-শুনে ভুল করেও তো প্রেম করেছে?

হ্যাঁ; কিন্তু শুধু চিঠিতে। বিশ্বাস করুন, শুধু চিঠি। শারীরিক কোন ইয়ে-টিয়ে...একেবারেই না। একবার সেই-যে ট্রেনের মধ্যে দুজনের দেখা হয়েছিল, তারপর আর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতও হয়নি।

—পাত্র না-হয় রাজী হলো, পাত্রী কি বলে?

—পাত্রী আগেই রাজী হয়েছে। বলামাত্র রাজী হয়েছে।

না হয়ে কি পারে, মশাই? মেয়েটার এরকম একটা উপকার করলো যে, তার ওপর একটা শ্রদ্ধার ভাব···

—একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমার কাছেই বলতে-বলতে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা, বিভূতিবাবুর মত মানুষ কি রাজী হবে মামা? আমি ভরসা দিয়ে এসেছিলাম, রাজী করাবই।

—বেশ ভাল হলো। শীতলবাবুও একটা মনস্তাপের কারণ থেকে বেঁচে গেলেন।

—গেলেন বৈকি। এই দেখুন, আমাকে অনুরোধ করে কী চিঠি লিখেছিলেন শীতলবাবু।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের হাঁটুর উপর রেখে ফিসফিস করেন। —এই নিয়ে পাঁচ বার হলো, শীতলবাবুকে আমি একটা পারিবারিক বিপদ থেকে বাঁচালাম।

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ; তারপরেই হনহন করে হেঁটে আসরের ভিড়ের কলরব, মৃদঙ্গের শব্দ আর মণ্ডপের সোনালী ঝালরের ঝিকিমিকি উল্লাসের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসে। স্টার্ট নিতেও দেরি করে না। আবার ছোট মহুয়াবনের ছায়া পার হয়ে গালুডির দিকে ছুটতে থাকে নিশীথের গাড়ি, এবং সেই সাথে নিশীথের জীবনের একটা বিস্ময়ের হাসি। বাঃ, বেশ ভাল হলো, শেষ পর্যন্ত নীরাজিতারও দুঃখ করবার কিছু রইল না। নীরাজিতার জীবনকে নিশীথের মত মানুষের স্পর্শের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তারই কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে নীরাজিতা। হওয়া উচিত। বিভূতির জন্য শ্রদ্ধা জেগেছে নীরাজিতার মনে। ভাল হয়েছে। বিভূতির জীবনের সঙ্গিনী হয়ে ধন্য হতে চায় নীরাজিতা। হবে বৈকি।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নিশীথ। নীরাজিতারও

কোনও ক্ষতি হলো না। বরং নীরাজিতা এখন নিজেরই সৌভাগ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে, বিভূতির মত মানুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সুখী হওয়া অদৃষ্টের লেখা ছিল বলেই বোধহয় নিশীথ রায়ের চরিত্রটা ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল।

রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হবার সময় আর একবার হেসে ফেলে নিশীথ। নীরাজিতা বোধ হয় এখন মনে মনে নিশীথ রায় নামে শুচিতাহীন রক্তমাংসের একটা মানুষকে, একটা অধঃপতিত চরিত্রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একটা দুশ্চরিত্র মানুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাটা ভেঙে গেল বলেই-না নীরাজিতা বিভূতির মত মানুষের স্ত্রী হবার সৌভাগ্যটাকে পেয়ে গেল।

বাংলো-বাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে, আর দেওদারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ, নীরাজিতার বিয়ে।

সুনয়না আর প্রতিভা একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পাশের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ধীরেন।

নিশীথ বলে, বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে।

খবরটা যেন একটা চরম মীমাংসার খবর। বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার জীবনের মিলন হবে, খুবই ভাল খবর। এ খবর শুনে কেউ চমকে ওঠে না, ভ্রুকুটিও করে না। কারও চোখের চাহনিতে তুচ্ছতা বা বিদ্রূপের ছায়া কাঁপে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা স্বস্তিময় নীরবতা যেন থমথম করে। নিশীথের মুখের এই শুভ-বার্তার মধ্যে একটা পরিণামের প্রাণ যেন হাঁপ ছেড়ে বলছে, সব ভাল যার শেষ ভাল।

খবরটা যেন অনেকগুলি মানুষের জীবনের একটা উদ্বেগেরও অবসান। কেউ আর এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমি সুখী নই। প্রতিভা আর সুনয়নার মুখের হাসি যেন শান্ত অভি-

নন্দনের হাসি। ভালই হয়েছে ; যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। নীরাজিতার ভাবনায় ও কল্পনায় আর এমন কোন যন্ত্রণার দংশন থাকতে পারে না, যার জন্য কোন মানুষের বিরুদ্ধে তার মনে অহরহ একটা আক্রোশের জ্বালা ছটফট করবে। নীরাজিতার কোনই ক্ষতি হলো না।

ধীরেন বলে, খুব ভাল হলো।

ধীরেনের কথাগুলি যেন ধীরেনের একলা উপলব্ধির কথা নয়। এই চারটি মানুষেরই মন নীরবে ধীরেনের মত শুভেচ্ছার অনুভবে ভরে গিয়েছে। নীরাজিতা কিংবা বিভূতি, দুজনের কেউ ওদের জীবনের এই শুভ পরিণামের রূপ, ওদের বিয়ে, দেখবার জন্য নিমন্ত্রণের চিঠি দেবে বলে আশা করা যায় না ঠিকই ; ভয় আছে ওদের দুজনেরই মনে। এই চারজন মানুষের ছায়ার মধ্যে ক্ষত আছে, এবং সে ক্ষতকে খুবই ঘৃণা করে দুজনে। কিন্তু নীরাজিতার এই ঘৃণা আর এই ভয়কে ঘৃণা করতে এই চারজন মানুষের মনে কোন ইচ্ছার ছায়াও নেই ; বরং, মনে হয় যে, এবং সত্যই একেবারে স্পষ্টভাষায় আর একটা কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দেয় নিশীথ।

—বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে অবধারিত ছিল বলেই...

সুনয়না হাসে, কি ?

—প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেল।

ধীরেন বলে, এবং, সুনয়না আমাকে ডাল-ভাত খাওয়াবার গ্যারান্টি দিয়ে একটা গাঁয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

গালুডির এই বাড়িতে এই চারজন মানুষের নিরুদ্বিগ্ন ও কৃতার্থ জীবনের হাসি আরও অনেকক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। খাওয়ার পাট সারা হবার পর যখন কালিকাপুরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় নিশীথ আর প্রতিভা তখন শুধু এদের দুজনের মুখের হাসি নয়, ধীরেন আর সুনয়নার মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক অনুভবের আবেশে ছলছল করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে

তাকায় ; চোখে চোখে যেন একটা ক্ষমার উৎসব জেগে উঠে নীরবে বলছে, যদি কোন ক্ষতি করে থাকি, তবে ক্ষমা কর।

আবার কালিকাপুরের দিকে ; গালুডির রেললাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে নিশীথের গাড়িটা আবার সড়কের দুপাশের শাল আর সেগুনের ছায়ার ভিতরে এসে পড়তেই নিশীথ বলে, এইবার একটা কথা সাহস করে বলবো, প্রতিভা ?

প্রতিভা হাসে।—প্রতিভার কাছে ভয় করে কিছু বলবার ছিল নাকি ?

নিশীথও হাসে। —ছিল।

—কি কথা ?

—নীরাজিতার কথা। নীরাজিতা যে খুশি হয়ে বিভূতিকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এ খবর শোনবার পরে মনের একটা ভার মিটে গেল। বেচারার তো কোন দোষ···

—হ্যাঁ, বল—

—নীরাজিতা চরিত্রহীন মানুষকে ভয় পায় আর ঘৃণা করে, এটা নিশ্চয় ওর অপরাধ নয়। বিভূতির মত মানুষের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়াই উচিত ছিল, খুব ভাল হলো।

রাজপোখরাতে ডালিয়া বাগানের কাছে একটা ছোট চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোট একটা টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিভার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ঠিক এই কথাগুলি লিখলেন শিবদাসবাবু। খুব ভাল হলো, প্রতিভা। আজ নীরাজিতার সঙ্গে বিভূতির বিয়ে হয়ে গেল। আমি খুব ফুর্তি করে বিয়েতে খেটেছি। মাংস রাঁধবার ভার আমার উপরেই ছিল।

শিবদাসবাবুর চিঠি লেখা যখন সারা হয়, ঠিক তখনই অলক্তকের বারান্দার আলপনা পিছনে ফেলে রেখে আর বিভূতির পাশে পাশে

হেঁটে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় নীরাজিতা।

অলক্তকের শঙ্খরবমুখর ফটক পিছনে ফেলে রেখে বিভূতির গাড়িটা যখন গম্ভীর গুঞ্জন তুলে আস্তে আস্তে ঝাউ-এর ছায়া পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন ডালিয়ার বাগানের কাছে শিবদাস-বাবুর চেহারাটার দিকে তুজনে একসঙ্গে তাকায়, বিভূতি আর নীরাজিতা। তারপর তুজনেই তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

বিভূতির গাড়ি এখন আর পথের কোথাও থামবে না। রাজ-পোখরা থেকে সিনি; সিনিতে বিভূতির বাংলো-বাড়িটা এখন অনেক আলো আর অনেক ফুলের স্তবক ঘরে ঘরে সাজিয়ে নিয়ে বিভূতি আর নীরাজিতার জীবনের শুভমিলনের আনন্দ বরণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

শুভ মিলন নিশ্চয়; কিন্তু শুধু শুভ বলতে রাজি নয় খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি।

বিভূতি বলে, শুদ্ধ বিবাহ বলতে আমার আরও ভাল লাগে।

—কি বললে?

—চরিত্রের দিক দিয়ে যারা শুদ্ধ, শুধু তাদেরই বিয়েকে একটা শুভ ব্যাপার বলা যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই যে, ঘোর চরিত্রহীন মানুষগুলোও নিজেদের বিয়েকে শুভ-বিবাহ বলে রঙীন কাগজের চিঠিতে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে নেমন্তন্ন করতে একটুও লজ্জা পায় না।

নীরাজিতা হেসে ওঠে।—তাতে নিজেকেই ঠকানো হলো।

—কিন্তু এ-ও এক আশ্চর্য, ঠকতেও লজ্জা পায় না। দৃষ্টান্ত…

গাড়ি ড্রাইভ করছে বিভূতি; এবং একই সীটের উপর বিভূতির পাশে বসে আছে নীরাজিতা। গাড়ির ভিতরে যে আলোটা জ্বলছে, সে-আলোটাকে জড়িয়ে একটা ফুলের মালা দুলছে। চকিতে

একবার নীরাজিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিভূতি বলে, আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাদের কথা বলছি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ নীরা ?

নীরাজিতা হাসে, খুব বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু ওদের কথা আমাদের আলোচনা না করাই ভাল।

—ঠিক কথা।

চুপ করে বিভূতি, এবং নীরাজিতাও চুপ করে চলন্ত গাড়ির শব্দের সঙ্গে জীবনের এক বিপুল কৌতূহলের চঞ্চলতা মিশিয়ে দিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে। বিভূতি, খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি, যার বুকের বাতাস শরৎকালের সকালবেলার বাতাসের মত, একফোঁটা ধুলোর চিহ্ন নেই যে বাতাসে, সেই মানুষ যেন নীরাজিতারই অদৃষ্টের ইঙ্গিতে পরিত্রাতার মত এসে নীরাজিতাকে একটা ভয়ানক ভুলের গ্রাস থেকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেরই জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছে। কালিকাপুরের নিশীথের তুলনায় কোন দিক দিয়ে ছোট হওয়া দূরে থাকুক, বরং সব দিক দিয়ে বড়, এই বিভূতি যে, নীরাজিতার জীবনে একটা আকস্মিক গৌরবের উপহার। খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতি রোজগারে বড়, পদ-প্রতিষ্ঠায় বড়, চরিত্রে বড়। নীরাজিতার মনে দুঃখ করবার কিছু নেই। সব দিক দিয়ে জিত হয়েছে নীরাজিতার। সব খবর জানেন পিসিমা, তাই আশীর্বাদ করবার সময় তিনি আনন্দের আবেগে কেঁদে ফেলেছেন।—কোনদিন তো শিবপুজো করিসনি নীরা, তবু তোর ওপর শিবের কী দয়া! নইলে এত সহজে ওরকম খারাপ স্বভাবের একটা মানুষের মতলব থেকে বাঁচতে পারতিস না। সৌভাগ্য বলে সৌভাগ্য! পুণ্যি বলে পুণ্যি! নইলে কি বিভূতির মত সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয় ?

ভাবলে এখনও ভয় করে। কালিকাপুরের নিশীথ, ইস্, কী অদ্ভুত ছলনা জানে লোকটা! যার শরীরটা এত কলুষ ছুঁয়েছে, তার

মুখটা কী অদ্ভুত কপটতা করে খাঁটি ভালবাসার হাসি হেসেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল; পিসিমা সেদিন একটুও বাড়িয়ে বলেননি; শিবেরই দয়া; নীরাজিতার জীবন একটা উচ্ছিষ্ট পৌরুষের স্পর্শে অপমানিত হবার ভয় থেকে বেঁচে গিয়েছে।

মনে মনে নিজের বেকুব মনটার উপরেও রাগ করে নীরাজিতা। না বুঝে-সুঝে, একটুও সন্দেহ না করে ট্রেনের কামরাতে দেখা একটা মানুষের চোখের চাহনির সেই আগ্রহটাকে কেন হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল? মনটা লোভী হয়ে উঠেছিল; সে-কথা ভাবতে মনের উপরই রাগ হয়। কিন্তু সেই ভুলের মনটাকে ক্ষমা করেও দিতে পেরেছে নীরাজিতা। কি করে বোঝা যাবে? দেখে বুঝতে পারা যে নিতান্তই অসম্ভব। ফুলের পাপড়ির উপর যে শিশিরের ফোঁটা টলমল করে, সেটা সাপের বিষের ফোঁটাও হতে পারে বলে সন্দেহ করতে পারে কে? সন্দেহ করবার এত বড় শক্তিও বা কজন মেয়ের আছে?

শুধু কি নিজেরই সেই ভুলের মনটার উপর রাগ হয়? নিশীথের মুখটা মনে পড়লে এখনও নীরাজিতার মনে একটা ঘৃণাভরা রোষের জ্বালা ছটফটিয়ে ওঠে। অলক্তকের ফটক তালাবদ্ধ হয়ে একটা কঠোর উপেক্ষা দিয়ে মানুষটাকে তাড়িয়ে যে শাস্তি দিয়েছে, সেটা কি আর এমন শাস্তি? আরও শাস্তি হওয়া উচিত ছিল; এবং বুঝতেই পারা যাচ্ছে, সে শাস্তি পেয়ে যাবে লোকটা। প্রতিভার মত মেয়ের চরিত্রের কাছে অপমানিত হতে হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, হয়েই যেন যায়, লোকটার চরিত্রহীন আহ্লাদের প্রাণটা!

—কি ভাবছো, নীরা?—হঠাৎ প্রশ্ন করে বিভূতি; এবং সেই প্রশ্নের শব্দে যেন একটু চমক লেগে কেঁপে ওঠে নীরাজিতা।

—বাড়ির কথা ভাবছো বোধ হয়? এবং সেই জন্যে এত গম্ভীর হয়ে···

নীরাজিতা হেসে ফেলে। —বাড়ির কথাই ভাবছি, কিন্তু সে বাড়ি অলক্তক নয়।

—তবে?

—যে বাড়িতে যাচ্ছি।

—সেটা আমার নিজের রোজগারের টাকায় কেনা বাড়ি। সে-বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবারও ওদের সাধ্যি নেই।

নীরাজিতা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—ওরা···ওরা তোমার বাড়ির কাছে আসবে কেন?

বিভূতি হাসে, তুমি কাদের কথা ভাবছো?

—আমি ভাবছি,···ঐ ওদের কথা···যাদের বিয়েকে একটা ভয়ানক অশুচি কাণ্ডের দৃষ্টান্ত বললে তুমি এখনই···

—না না, ওদের কথা বলছি না। শিবদাস দত্তের মেয়ে আর নিশীথ কোন সাহসে আমার বাড়িতে আসবে?···ওরা নয়; আমার দুটি দরিদ্র ভ্রাতা আছে, দুটি হতভাগা, সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। যাট-সত্তর টাকা মাইনে পায়।

—ঠাকুরপোরা কি কেউ···

—না, কেউ না। ওরা কেউ আসেনি। ওদের আসা নিষেধ।

—তোমার বিয়েতেও যদি ওরা না আসে···!

—ওরা তো আসতেই চায়। কিন্তু আমি আসতে দেব কেন?

ওরা ভাল করে জানে যে, বড়দার চরিত্রে কোন মায়াভরা দাদাপনা নেই।

নীরাজিতা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলে, আমি সত্যিই সব খবর জানি না। কিন্তু ধারণাও করতে পারছি না, কেন তুমি ওদের সম্পর্কে এত···

—ওরা এলে আর যেন নড়তেই চায় না। বড়দার সঙ্গে দেখা

করার কাজটা তো এক সেকেণ্ডেই হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আরও সাতটা দিন ধরে পড়ে থেকে বড়দার অন্ন ধ্বংস করতে চায়। এসব আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

নীরাজিতা আরও কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে, সিনির বাড়িতে কি তাহলে শুধু মা একাই এসেছেন?

—মা? কার মা?

—তোমার মা?

—আমার মা তো দেশের বাড়িতে থাকে।

—তা জানি। বাবার কাছে শুনেছি…

—কি শুনেছ?

—তোমার মা এখন হালিসহরে তোমাদের পুরনো বাড়িতে একাই থাকেন।

—ঠিকই শুনেছ।

—আমি ভেবেছিলাম, তোমার বিয়েতে মা নিশ্চয় সিনিতে আসবেন।

—আসবার উপায় নেই।

—কেন?

—আসতে দিচ্ছে কে? দেশ-গাঁয়ের একটা বুড়ি মানুষকে আমার সিনির বাড়িতে থাকতে দিলে, ম্যাকেঞ্জি, লিস্টার আর হ্যারিস মনে করবে যে, অনর্থক একটা বুড়ি চাকরানিকে খাটিয়ে-খাটিয়ে কষ্ট দিচ্ছে বিভূতি।

—সর্বনাশ!—নীরাজিতার বুকটা যেন বেফাঁস চমকে উঠে ছোট একটা আর্তনাদ ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

—সর্বনাশ মানে?—স্টিয়ারিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নীরাজিতার মুখের দিকে চকিতে একটা শক্ত চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে, এবং গম্ভীর গলার স্বর গমগমিয়ে প্রশ্ন করে বিভূতি।

—সাহেবরা ওরকম ধারণা করলে করুক না কেন। তা বলে

বুড়ো মা কি তার ছেলের কাছে থাকবে না? এ তো আশ্চর্যের কথা।

—একটুও আশ্চর্যের কথা নয়, নীরা। মা যে কী ভয়ানক উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে, সেটা তুমি নিজের চোখে না দেখবার আগে বিশ্বাস করতে পারবে না।

— শুনিই না; কী উৎপাত করেন?

—আমার সিনির বাড়িতে মাকে একবার আসতে দিয়েছিলাম। সাত দিন ছিল। কিন্তু সেই সাত দিন শুধু কেঁদে-কেটে আর গালাগালি দিয়ে আমাকে ছারখার করেছে।

—বুঝলাম না।

—আমার দুটি দরিদ্র হতভাগা ভ্রাতাকে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করি না, এই হলো আমার পাপ; এবং কেন সাহায্য করবো না আমি, এই হলো আমার মাতৃদেবীর অভিযোগ।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। সিনি পৌঁছতে দেরি আছে। দূরে পাহাড়ের মাথার উপরে মেঘের গায়ে ফিকে জ্যোৎস্নার সাদা ছোঁয়া লুটিয়ে পড়েছে। এবং নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিও যেন সাদা হয়ে বিভূতির হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ ঠিকই, বেশ শক্ত হাত। স্টিয়ারিং-এর লোহার সঙ্গে বিভূতির হাতের মুঠো দুটো লোহার গিঁটের মতই শক্ত হয়ে এঁটে আছে।

নীরাজিতার চোখ দুটো সাদা হয়ে গিয়েও যেন জোর করে একটা রঙিন কল্পনার ছবি দেখবার চেষ্টা করছে। সিনির বাড়িটা কি সত্যিই বিভূতির একলা জীবনের কঠোর শাসনে একেবারে নীরব হয়ে আছে? হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীরাজিতাকে হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবার কেউ নেই? বিভূতির বৌ দেখতে কী সুন্দর, এমন একটা কথা বলবারও কোন মানুষ থাকে না সেখানে?

বিভূতি বলে, আমার বাড়িতে তুমি কোন বাজে গণ্ডগোল শুনতেই পাবে না, নীরা। হৈ-হল্লা আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

তবে কি সিনির বাড়িতে কোন উৎসবের আয়োজন নেই? খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির জীবনের একটা মধুর পরিণামের ঘটনাকে প্রীতি জানাবার জন্য কেউ সেখানে আসবে না?

—আমার একটা আশঙ্কা আছে, নীরা।

—কি?

—মস্ত বড় একটা বাজে খরচের পাল্লায় পড়তে হবে।

—কিসের জন্য?

—একটা প্রীতিভোজ দিতেই হবে। অন্তত হ্যারিস, লিস্টার আর ম্যাকেঞ্জিকে একটা কক্‌টেল দিতেই হবে; তা ছাড়া আর আট-দশজন ভি আই পি আছেন। তাঁদেরও একটা খানাপিনা না দিলে নয়। অন্তত তিন-চার শো টাকা খরচ হয়ে যাবে।

সিনির দিকে মোড় ফেরবার সাইন দেখাচ্ছে যে পোস্টটা, সেটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ির হেড-লাইটের আলো পড়ে লেখাটা জ্বলছে—টু সিনি, সেভেন মাইল্‌স্‌। কিন্তু নীরাজিতার চোখের সাদা চাহনির উপর যেন রক্তাক্ত আতঙ্কের ছায়া লুটিয়ে পড়েছে। লেখাটাকে কতগুলি লাল আঁচড়ের দাগ বলে মনে হয়।

টু সিনি; নীরাজিতার জীবন খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির জীবনের ঘরের দিকে হুহু করে ছুটে চলে যাচ্ছে। কারণ বিভূতির গাড়ি বেশ স্পীড নিয়ে ছুটছে। কিন্তু নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা ভীরুতা যেন এই স্পীড সহ্য করতে না পেরে এখনই গাড়ি থেকে সড়কের ধুলোর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেতে চায়।

বিভূতি বলে, অবশ্য, সে আশঙ্কার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

—কি বলছো তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার শুদ্ধ-বিবাহের আনন্দ সামান্য একটা তিন-চারশো টাকার খরচকে এত ভয় করে কেন? কথা বলতে গিয়ে হাঁসফাস করতে থাকে নীরাজিতা।

হেসে ওঠে বিভূতি। কোন ভয় করি না। দশ-পনের জনকে

ককটেল দিতে আর খাওয়াতে তিনশো টাকা খরচ হয় হোক; কণ্ট্রাক্টার মূলচাঁদকে বলবো, পুরো তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

—তাতে কি হবে?

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি। তাতে মুলচাঁদ তখনই খুশি হয়ে তিন হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দেবে, আর ধন্য হয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার নীট লাভ হবে দু হাজার সাতশো টাকা।

টু সিনি! এইবার সোজা সিনির সড়ক ধরে ছুটে চলেছে বিভূতির গাড়ি। দূরে ছোট ছোট অনেক আলোর ভিড় দেখা যায়। বোধহয় বাবুদের কোয়ার্টার; কিংবা অফিসারদের বাংলোয় আলো জ্বলছে।

সাদা ধবধবে একটা বাড়ির সামনের লনে আলোর কাছে এক-একটা ক্যাম্প-চেয়ারের উপর গড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গিনীর শরীর। জাঙিয়ার আকারের ছোট প্যাণ্ট, আর দেখতে কাঁচুলির চেয়েও ছোট আকারের নেটের ব্লাউজ গায়ে, কতকগুলি সাদা ধবধবে আলস্যের ফুল নেশাতুর হয়ে পড়ে আছে।

বিভূতি হাসে। একটা মজার কথা বলি, শোন নীরা। ঐ যে দেখছো, ওদেরই মত একটি বস্তু একবার আমার হাত ধরতে এসেছিল; কিন্তু তাকে ছুটি কথায় এমনই অপমান করে দিয়েছিলাম যে, বিলিতী সেই মিস মহোদয়া এদেশ ছেড়ে সোজা বিলেতে চলে গেল।

—শুনেছি, শুনেছি, শুনেছি! বলতে বলতে নীরাজিতার গলার স্বর যেন চেঁচিয়ে ওঠবার জন্য ছটফট করে ওঠে। বিভূতির মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা জ্বলজ্বলে হাসি হাসতে থাকে নীরাজিতা। তোমার এই গ্লোরির গল্প টাটানগরের মামীর কাছে শুনেছি; কলকাতাতে বউদির কাছে

শুনেছি। রাজপোখরাতে ঘরভরা লোকদের কাছে বাবা জোরে জোরে চেঁচিয়ে এই গল্প বলেছেন, তাও শুনেছি।

বিভূতি হাসে। শুনে তুমিও কি একটু···

—কী ?

—আশ্চর্য হওনি ?

নীরাজিতার গলার স্বরে যেন একটা ধোঁয়াটে উল্লাসের শব্দ ঠক করে জ্বলে ওঠে। খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর, সেই জন্যেই মামাকে বলেছিলাম যে···

—কি ?

নীরাজিতা হাসে। বলেছিলাম, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দেওয়াতে পারেন, তবেই আমার বিয়ে হতে পারে। নইলে বিয়েই হবে না। পৃথিবীতে আর কাউকে আমি বিশ্বাসই করবো না।

—কি আশ্চর্য, তোমার সেই অভিমানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো, নীরা।

—জয় বলতে জয়! শেষ পর্যন্ত তুমিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছ যে, নীরাজিতা আর যে ভুল করুক না কেন···

—হ্যাঁ নীরা, যখন কোন সন্দেহ রইল না যে, নীরাজিতা আর যা ভুল করে থাকুক না কেন, সে-ভুল করেনি নিশ্চয়, যে-ভুল করলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, তখন···সত্যি কথাটা একটু বেহায়ার মত বলতে ইচ্ছে করছে নীরা, তখন তোমাকে মনে মনে বড় ভাল লেগে গেল। মনে হলো, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে বোধ হয়। কিন্তু···

—কি ?

—কিন্তু ওভাবে এক নারীকে শুধু মনে মনে ভালবাসাও ঠিক উচিত হবে না বলে মনে হলো। কে জানে, নীরাজিতাও তো পরস্ত্রী হয়ে যেতে পারে; কার না কার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে

নীরাজিতার। তাতে চিরকাল মনের ভিতরে এই লজ্জা থেকে যেত যে, আমি মনে মনে ; পরনারীর জন্য নেক অনুরাগ পুষেছি। তাতে পৃথিবী কোন মেয়েকে বি করতে আমার বিবেকে বাধতো। মনে হত, বেচারার প্রতি অন্যায় করছি। কিন্তু···

কথা শেষ না করেই চকিতে আর একবার নীরাজিতার বিস্মিত মুখটার দিকে তাকিয়ে বিভূতির চোখদুটোও একটা নিখুঁত শুদ্ধতার গর্বে হেসে-হেসে ঝকঝক করে। কিন্তু আমার গর্ব ও আনন্দ এই যে, জীবনে প্রথম যাকে মনে মনে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, তাকেই আমি বিয়ে করলাম। আমার চরিত্রের সম্পর্কে আমার একবিন্দুও অভিযোগ নেই, নীরা।

কী কঠোর শুদ্ধতার সাধনা! নিজের চরিত্র সম্বন্ধেও বিভূতির মনে কোন ক্ষমাময় দুর্বলতা নেই। বিভূতির এই শুদ্ধ পৌরুষের উপর কোন চরিত্র-ঘাতক কলুষের ছায়াও পড়েনি কোনদিন গর্বিত হবারই কথা।

বিভূতির গাড়ি চমৎকার একটা উজ্জ্বলতার কাছে এসে পড়েছে। বিভূতির বাংলোর ফটকের কাছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। চাপকান-পরা দুটি মানুষ। বোধহয় বিভূতিরই চাপরাসী আর বেয়ারা।

বিভূতির গাড়ি থামে। পিছনে আরও একটা গাড়ির শব্দ প্রচণ্ড হর্ষের শিহর তুলে ছুটে আসছে শোনা যায়। হ্যাঁ, নীরাজিতা আর বিভূতির জীবনের শুভ ও শুদ্ধ মিলনের জন্য রাজপোখরার অলক্তকের যত প্রীতি আর আশীর্বাদের বস্তুময় সম্ভার নিয়ে যে গাড়িটার আসবার কথা, সেই গাড়িটাও প্রায় এসে পড়েছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এইবার নীরাজিতার একটা হাত ধরে বিভূতি। —এস,নীরা।

নীরাজিতার হাতটা যেন কেঁপে ওঠে। বিভূতির হাতটা কত

ঠাণ্ডা! যেন একটা নিখুঁত লোহার আগ্রহ নীরাজিতার নরম হাতটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

খরসোয়ানের রাত্রি যখন একেবারে নীরব হয়ে যায়, আর বিভূতির এই চমৎকার চেহারার বাড়িটা মাঝরাতের চাঁদের আলো গায়ে জড়িয়ে ধবধব করে, তখন ইস্পাতের আলমারির একটি দেরাজ টেনে ব্যাঙ্কের জমার বইগুলি এক এক করে খুলে ব্যালান্সের অঙ্কের সংখ্যাগুলির দিকে তাকায় আর মনে মনে মনে হিসাব করে বিভূতি। এবং দেরাজ বন্ধ করেই মৃদুস্বরে ডাক দেয়, নীরা।

এতক্ষণ ধরে এই ঘরের ভিতরই একটা সোফার উপর বসে ছিল নীরাজিতা। কিন্তু জানে না বিভূতি, কখন তার ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে নীরাজিতা, এবং এখন কোন ঘরে কোথায় বসে আছে আর কি করছে, তাও কল্পনা করতে পারে না। ডাক দেবার পর সাড়া না শুনতে পেয়ে আবার ডাক দেয় বিভূতি, নীরা, কোথায় গেলে তুমি?

কি আশ্চর্য, নীরাজিতা কি ভুলেই গেল যে, খরসোয়ানের এই রাতটা আজ বিভূতি ও নীরাজিতার জীবনে সত্যিকারের প্রথম শুভরাত্রি হবার গৌরবে চিহ্নিত হয়ে যাবে? খাওয়ার পালা সারা হবার পরে, এই তো ঘণ্টা দুই আগে, বিভূতি একেবারে স্পষ্টভাষায় এবং চোখের চাহনিতে কোন কুণ্ঠা না রেখে নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে হেসেছে, আর বেশি দেরি হবে না, নীরা, কিন্তু তুমি ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি শুধু ব্যাঙ্কের জমার বইগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই…

না, ঘুমিয়ে পড়েনি নীরাজিতা। জাগা চোখ-দুটোকে অপলক করে নিয়ে এই ঘরের ভিতরই সোফার উপর চুপ করে বসেছিল; এবং মাঝে বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে কে-জানে কি দেখবারও চেষ্টা করেছিল। তারপর সোফা থেকে উঠে আর সেন্ট ও পাউডারে

সুরভিত করা সেই সুন্দর চেহারার একটা ক্লান্ত ও বিস্মিত শোভাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনের বারান্দার রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খরসোয়ানের আকাশের চাঁদটাকে দেখতে নিশ্চয় খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে নীরাজিতার; তা না হলে এই দুই ঘণ্টা ধরে রেলিং-এর কাছে একই জায়গায় একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন, আর চোখ তুলে শুধু আকাশের দিকেই বা তাকিয়ে থাকে কেন নীরাজিতা?

নীরাজিতার চোখের দৃষ্টিই বা এত কঠোর রকমের শান্ত কেন? ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা কেন? আঙুলের নতুন আংটিটা এত ঢিলে মনে হয় কেন? হাতের আঙুলগুলি কি হিমের ছোঁয়া লেগে সিঁটিয়ে গিয়েছে?

রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে গিয়ে নীরাজিতার হাতটাও কেঁপেছে। আর, রাগ করে কপালটাকে টিপে ধরেছে নীরাজিতা। ছিঃ, এত ভয় কিসের? বুকটা মিছিমিছি এরকম ঢিপ ঢিপ করে কেন?

—নীরা! তুমি এখানে এসে কি করছো?

বিভূতির ডাক শুনে চমকে ওঠে নীরাজিতা। বিভূতির মৃদু গলার স্বরে যেন একটা বিরক্ত বিস্ময়ের বাতাস ফিসফিস করে উঠেছে। ঠিকই তো, বিভূতির একটু বিরক্ত হবারই কথা। বিভূতিকে হঠাৎ একলা করে দিয়ে ছেড়ে এখানে চলে এসে নিজেকেও কেন একলা করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরাজিতা? নীরাজিতা কি জানে না, এই কিছুক্ষণ আগে বিভূতির চোখের চাহনিটা কুণ্ঠাহীন হয়ে, কি বিপুল আশায় উৎফুল্ল হয়ে নীরাজিতাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল?

খরসোয়ানের এই নীরব রাতের আকাশের চাঁদ যে নীরাজিতার জীবনের এক পরম অঙ্গীকারের সঙ্কেত হয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—সময় হয়েছে, নীরাজিতা। আর অপেক্ষা করতে হবে না। যে বিভূতির চরিত্রের গৌরবকাহিনী শুনে নীরাজিতার বাইশ বছর

বয়সের শরীরটা শ্রদ্ধার আবেশে বিচলিত হয়ে মামার কাছে একেবারে বেহায়া হয়ে বলেই দিতে পেরেছিল যে, বিভূতিবাবুর সঙ্গে যদি হয়, তবে হয়ে যাক; তা না হলে, এখন আর আমার বিয়ের কথা নিয়ে আপনাদের কোন চেষ্টা আর কোন চিন্তা করবার দরকার নেই।

খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের সেই বিভূতি আজ নীরাজিতার শরীরের সেই শ্রদ্ধার আবেশ বরণ করবার জন্য নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু···কি-যেন বলতে চায় নীরাজিতা। সুরভিত মূর্তিটাকে হঠাৎ একটু কুঁকড়ে দিয়ে আর আঁচলটাকে দু-পাক দিয়ে হাতে জড়িয়ে রেলিং-এর কাছ থেকে এক-পা পিছনে সরে যায়।

বিভূতি হাসে। খরসোয়ানের এই ভয়ানক শান্ত রাতের চাঁদটারই মত নীরব ও ধবধবে সাদা হাসি। নীরাজিতার কাছে এগিয়ে আসে বিভূতি, আর নীরাজিতাকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—আঃ, নীরাজিতার বুকে একটা অদ্ভুত রকমের আতঙ্কের নিশ্বাস যেন ফুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু বিভূতির বুকের যত অনুভবের পেশী আর স্নায়ুগুলি যেন নীরাজিতার সেই ভীরু শরীরের আর্তনাদ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। নীরাজিতার কানের কাছে ফিসফিস করে বিভূতি। —আমার নীরা যে এইরকম ভয় পাবে, শিউরে উঠবে আর হেজিটেট করবে, এ আমি জানতাম···আমি জানতাম···আমি···

বলতে বলতে বিভূতির মুখের সেই শান্ত হাসি যেন উগ্র আগুনের আভার মত জ্বলতে থাকে। বিভূতির প্রাণ যেন ঠিক এইরকম একটি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, কম্পিত, আতঙ্কিত ও ঠাণ্ডা কোমলতার ছোঁয়া আশা করেছিল। এইরকম একটি অনিচ্ছা-ভীরু শরীর; এক-পা পিছনে সরে যাওয়া একটি চকিত বিস্ময়; শরীরের উপর এইরকম একটি চরিত্রময় আবরণের অনাহত শাসন বাঁচিয়ে রেখেছে যে নারী, সেই নারীর ভালবাসাকেই যে ভালবাসা বলে মনে করে বিভূতি। খুশি হয়েছে বিভূতি; বিভূতির কল্পনা আজ নীরাজিতার শুদ্ধ শরীরের সব

অনুভব আর লজ্জা আপন করে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিভূতির হাত দুটো ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নীরাজিতা যেন এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। বিভূতির দুহাতের এই বন্ধনের বেড়া থেকে একটু আলগা হবার জন্য মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠছে নীরাজিতা।

বিভূতি বলে—কি, নীরা ?

—ছাড়, একটা কথা বলছি, শোন।

—বল।

—শরীরটা ভাল বোধ করছি না। ভাল লাগছে না।

বিভূতি হাসে। —ভয় করছে, নীরা ?

—হ্যাঁ।

আরও দুরন্ত আগ্রহে নীরাজিতাকে বুকের উপর চেপে ধরে বিভূতি। ভয় করছে নীরাজিতার ? কী সুন্দর ভয় ! বিভূতির চোখ দুটো যেন এইরকম একটি ভয় ছিন্নভিন্ন করবার সৌভাগ্যে মত্ত হয়ে দপ দপ করে জ্বলছে। নীরাজিতার ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা ! কী চমৎকার শীতলতা ! বিভূতির নিশ্বাসের পিপাসা যেন ঠিক এইরকম একটি শীতলতাকে লুব্ধ দংশনে বিক্ষত করবার জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

—এস, নীরা !—নীরাজিতার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চরম আহ্বানের ভাষা ধ্বনিত করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন আরও মুগ্ধ হয়ে কেঁপে ওঠে।

আর, নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা দ্বিধাহীন আত্মোৎসর্গের মত বিভূতির সেই আহ্বানের স্বরে যেন বন্দী হয়ে বিভূতির পাশে পাশে হেঁটে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

এবং তারপর, খরসোয়ানের রাতের চাঁদ যখন দূরের পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি এসে ধূলেলা বাতাসের আবরণে ময়লা হয়ে যায়, এবং বিভূতির এই চমৎকার বাড়ির চেহারাটাও ঠিক আর ধবধব করে না, তখন বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর স্নানসারা

শরীরটাকে নতুন করে সাজাতে গিয়ে কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। ভেজা শাড়ীটা যেন একটা রক্তাক্ত স্মৃতির জ্বালাময় লজ্জার কুণ্ডলীর মত গুটিয়ে রয়েছে। অলক্তকের মেয়ের আতঙ্কিত শরীরটার প্রত্যেক লজ্জা আর বেদনার্ত চমক-গুলিকে পরমলোভ্য প্রসাদের মত আত্মসাৎ করতে গিয়ে কি প্রখর আনন্দে জ্বলজ্বল করেছে অলক্তকের মেয়ের স্বামী ঐ বিভূতির চোখ দুটো! কিন্তু জ্বলছে কেন নীরাজিতার স্নানসারা ঠাণ্ডা শরীরটা? কি আশ্চর্য, শরীরটাতে এখনও ময়লার ছোঁয়া লেগে আছে বলে মনে হয়।

খরসোয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে আর মিশিয়ে দিয়ে নীরাজিতার প্রাণটাও হেসে উঠতে পেরেছে। পুরো তিনটে মাস পার হয়ে গেল, তবু রাজপোখরার অলক্তকের কাছে ফিরে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্য নীরাজিতার প্রাণে যেন কোন দাবিই নেই। শীতলবাবুর কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে। কবে আসতে চাও নীরাজিতা? দিন ঠিক করে শুধু একটা চিঠি দিও; তোমাকে আনবার জন্য সেদিনই গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু অলক্তকের এরকম এক-একটা স্নেহাক্ত আহ্বানের ব্যাকুলতার স্বর শুনেও বিচলিত হয় না নীরাজিতার মন। চিঠির উত্তরে চিঠি দেয় নীরাজিতা, যাব, কিন্তু দেখি কবে যেতে পারি। ওর যে এখন খুব কাজের চাপ; একটুও সময় নেই।

বউদির চিঠি এসেছে। বিভূতিবাবুর না হয় সময় নেই, কিন্তু তোমার সময়ের অভাব কোথায়? বিভূতিবাবু না হয় কাজের চাপ কমে গেলে আসবেন। কিন্তু তোমার একবার আসতে অসুবিধে কিসের?

বউদির চিঠির উত্তরে যে-কথা লিখে জানিয়েছে এবং আজও চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা, সে-কথা বউদিকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

এবং বউদিও মন্তব্য করেছেন, এরকমটি দেখিনি। দুটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি সহ্য করতে পারে না, এ যে একেবারে কপোত-কপোতীর প্রেম !

নীরাজিতার চিঠির বক্তব্য পাঠ করে অলক্তকের মানুষগুলি ঠিক দুঃখিত হতে পারেনি ; বরং মনে মনে একটু খুশিই হয়েছে। নীরাজিতা সত্যিই রাজপোখরাতে আসতে চায়, কিন্তু একলাটি আসতে চায় না। যেদিন আসবে, সেদিন দুজনে একসঙ্গেই আসবে। বিভূতির কাছছাড়া হয়ে দুটো দিনের অলক্তকের জীবনও সহ্য করতে কষ্ট হবে নীরাজিতার ; বেশ তো, আরও কিছুদিন দেরি করুক, তারপর দুজনে যেন একসঙ্গেই আসে।

অলক্তকের মানুষেরাও এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবার এসে নীরাজিতার খরসোয়ান-জীবনের হাসি আনন্দ আর তৃপ্তির ছবি দেখে গিয়েছে। সারাদিন বইপড়া আর ফুলের আদরের যত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে নীরাজিতা। টবের ফুলের গাছগুলিকে দিনে তিন চার বার করে যত্ন করা ; সকাল সন্ধ্যা দুবেলা ফুল তুলে মনের মত করে তোড়া বাঁধা, আর সেগুলি ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা ; এই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে ফেরে বিভূতি, তখন বিভূতিও দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, এবং বিভূতির চোখের চাহনিতে সুন্দর একটি তৃপ্ত অহংকারের হাসিও জ্বলজ্বল করে। নীরাজিতা যেন বিভূতিরই জীবনের সান্ধ্য-অভ্যর্থনা হয়ে আর সুন্দর সাজে সেজে অপেক্ষায় রয়েছে। বিভূতি এসে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই নীরাজিতা নিজের হাতে বেবি-টেবিলটাকে টেনে নিয়ে এসে বিভূতির সামনে রাখে ; টাটকা তোলা ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানি টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায় নীরাজিতা। তার পর চা-এর পট নিজের হাতে তুলে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখে। তারপরেই বিভূতির পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নীরাজিতা।

—রাজপোখরা থেকে কোন চিঠি এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে ?

—ঐ একই কথা।

বিভূতি হাসে।—বেশ তো, দুদিনের জন্য একবার ঘুরে এসো না কেন, নীরা ?

—না, যদি যাই তবে দুজনে একসঙ্গে যাব।

—বেশ তো, তবে চল, কালই চল।

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—কাল ! কেন ? তোমার কি সময় আছে ? ছুটি নিয়েছ নাকি ?

—ইচ্ছে করলেই ছুটি পেতে পারি।

নীরাজিতার চোখের চাহনি হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় ; যেন নীরাজিতার কল্পনার একটা ছবি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বিভূতি যদি ছুটি পায়, তবে বিভূতির সঙ্গেই রাজপোখরাতে যাবে নীরাজিতা। এটা তো নীরাজিতারই ইচ্ছার কথা। এতদিন এই কথাই বলেছে আর চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা। কিন্তু সেই ইচ্ছার পথ মুক্ত হয়ে যেতেই নীরাজিতার উৎসাহ যেন চমকে উঠে দুপা পিছনে সরে যেতে চাইছে। রাজপোখরাতে যেতে চায়না নীরাজিতা।

—কেন নীরা ? হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে কেন ?

নীরাজিতা যেন আনমনা ভাবনার ঝোঁকে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —না, এখন গিয়ে কোন লাভ নেই।

—লাভ নেই ! তার মানে ?

হেসে ওঠে নীরাজিতা। —তার মানে, এখন রাজপোখরার বাগানে পাকা আমের গন্ধ থমথম করে না। আম পাকতে এখনও দেরি আছে।

—তা হলে বল, আর মাসখানেক পরে রাজপোখরাতে যেতে চাও ?

—অ্যাঁ ? ···তা যেতে হবে বলে আশা করতে দোষ কি ?

—কি-রকম যেন এলোমেলো কথা বলছো নীরা ?

চমকে ওঠে নীরাজিতা। —এলোমেলো কথা ?

—হ্যাঁ ; মনে হচ্ছে, যেন কারও ওপর রাগ করে কথা বলছো।

নীরাজিতা ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে। —সত্যি কথা। রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর।

—কেন নীরা ?

—বাবা আর বউদিকে এই সামান্য একটা কথা লিখতে পারলাম না যে, হ্যাঁ, অমুক দিন রাজপোখরাতে যাব। তা ছাড়া··· বাড়ির চিঠিগুলোও এমন একঘেয়ে কথায় ভরা যে···

—কি ?

—রাজপোখরাতে যাবার জন্য মনে কোন উৎসাহ জাগে না।

বিভূতি হাসে। —এর আসল রহস্য কি, সেটা আমি বুঝতে পারছি।

—কি ?

—খরসোয়ানের এই বাড়ির জীবনকে তুমি বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছো।

নীরাজিতা মাথা হেঁট করে লাজুক হাসি লুকোতে চেষ্টা করে। —থাক ওসব কথা ; আর এক কাপ চা খাও।

এর পর খরসোয়ানের সন্ধ্যাটা যেন দুভাগ হয়ে যায়। ভিতরের একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে ইস্পাতের আলমারী খোলে বিভূতি। অনেক কাগজপত্রের ফাইল আর ব্যাঙ্কের অনেকগুলি জমার বই বের করে নিয়ে অন্তত একটা ঘণ্টা ধরে একটা হিসাবের আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকে। আর, নীরাজিতা আস্তে আস্তে বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় আর রেলিং-এর উপর দুহাতের ভর রেখে যেন আকাশের তারা গুণে গুণে একটা অদ্ভুত হিসাবের কাজে প্রাণটাকে ব্যস্ত করে রাখে।

আর, বুকের ভিতরের একটা দুঃসহ রাগের জ্বালার সঙ্গে যেন সমস্ত নিশ্বাসের জোর দিয়ে লড়াই করতে থাকে নীরাজিতা। রাগ হয় নিজের উপর; মিথ্যে নয় নীরাজিতার এই ধারণা। আর, কে জানে কেন, রাগ হয় অলক্তকের সেই ফটকটার উপর; রাগ হয় পৃথিবীর একটা বাস্তব সত্যের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার উপর। নিশীথ রায় নামে সেই মানুষটার চরিত্রে দোষ থাকে কেন? মানুষটাই নিষ্ঠুর। ওকে ক্ষমা করা যায় না।

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় নীরাজিতা। এবং এই লজ্জার মধ্যে যেন ভয়ানক গোপন অপমানের দংশন আছে। সে লোকটার উপর আবার রাগ হয় কেন? নীরাজিতার কাছে এসে ক্ষমা চাইবার জন্য কোন চেষ্টা করলো না; বলতে গেলে একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না; একেবারে নির্লজ্জ লোভের ডাকাতের মত যাকে সামনে পেল তাকেই, প্রতিভার মত মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে চলে গেল। প্রতিভা কি ওর ঘরের সুখের লোভটাকে এতদিনে হতাশ করে দিয়ে, সেই ভদ্রলোকের কাছে…কি যেন সেই ভদ্রলোকের নাম, বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতায় এখন একটা হোটেল করেছে যে ভদ্রলোক? প্রতিভার কীর্তির কথা যার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিল নিশীথ?

চলে গেলেই তো পারে প্রতিভা। কালিকপুর মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের বাংলো-বাড়িতে মিছা মায়ার খেলা জমাবার চেষ্টা না করে তার চরিত্রের সেই প্রাক্তন বান্ধবের কাছে চলে যেতে লজ্জা কেন? ঠিকানা কি জানা নেই? নিশীথ রায় নামে মানুষটাকে শান্তিতে থাকতে দিক না কেন প্রতিভা।

কী অদ্ভুত চিন্তা! চিন্তার রকম দেখে নিজের এই মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। নিশীথ রায় নামে সেই ভদ্রলোকের জীবনের ভালমন্দের কথা ভেবে খরসোয়ানের এই সান্ধ্য-জীবনের আনন্দ নষ্ট করে কেন নীরাজিতা?

যার কথা ভাবা উচিত, যার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে খরসোয়ানের এই তিনটি মাসের দিন ও রাতের সঙ্গে হেসে খেলে প্রাণটাকে মিশিয়ে দিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করছে নীরাজিতা, তার হিসাবের কাজ শেষ হতে মাঝে মাঝে রাত হয়ে যায়। তারপর খাওয়া ; এবং তার পর···

অসহ্য! নীরাজিতার জীবনটা যেন বাথরুমের একটা মিররের সামনে দাঁড়িয়ে, ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব ঘৃণা মুছে মুছেও শুদ্ধ হতে পারে না। মনে হয় বুকের ভিতরে কোণে কোণে ময়লা লেগে আছে।

বাথরুমের মিররটাই শুধু জানে, এক এক দিন কেঁদে ফেলেছে নীরাজিতা। এবং নীরাজিতাও ওর চোখের জল দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। কেন? কিসের যন্ত্রনা? শুদ্ধচরিত্র স্বামীর ছোঁয়া বরণ করে কোনও নারীর গা ঘিনঘিন করে উঠতে পারে না ; তবে কেন অলক্তকের মেয়ের এই শাস্তি?

দেখতে পাওয়া যায়, একটু দূরে একটা পোড়া বস্তির ছাই আর কয়লা ছড়িয়ে পড়ে আছে। খরসোয়ানে এসে এই চমৎকার বাড়ির জীবনের সাতটা দিন পার হতে না হতে এমনই এক সন্ধ্যায় ঐ বস্তিটাতে আগুন লেগেছিল। বস্তির বুকটা যেন হঠাৎ আতঙ্কে ছিঁড়ে গিয়ে ভয়ানক চিৎকার করে উঠেছিল। বস্তির লোকেরা হাঁড়ি ক্যানেস্তারা আর বালতি হাতে ছুটে এসেছিল।

জল চাই ; আগুন নেভাবার জন্য এই বাড়ির বাগানের ঐ প্রকাণ্ড ইঁদারা থেকে জল দেবার জন্য ফটকের কাছে এসে ভিড় করে চেঁচিয়ে উঠেছিল বস্তির লোকেরা—পানি চাহিয়ে, সাহেব। ঘর জল যাতা হ্যায়, সাহেব। মেহেরবানি কিজিয়ে, সাহেব।

কিন্তু কী চমৎকার নির্বিকার বিভূতির সেই চোখের দৃষ্টি। বস্তির আর্তনাদ শুনে একটুও বিচলিত হয়নি বিভূতি। —হঠ

যাও, গোলমাল মত্ করো।—শুধু একটি কথা বলে দিয়ে চুপ করে গিয়েছিল বিভূতি।

বিভূতির সেই নির্বিকার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরাজিতাও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্নও করেছিল, ওদের জল নিতে দিলে কি ক্ষতি হতো?

বিভূতি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কি লাভ হতো?

— অন্তত দু-চারটে ঘরের আগুন নেভাতে পারা যেত।

—বুঝলাম, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ?

নীরাজিতার কান দুটো একটা কঠোর বিস্ময়ের আঘাতে যেন কিছুক্ষণের জন্য বধির হয়ে গিয়েছিল।

নীরাজিতার এই বধিরতা যখন ভেঙেছিল তখন শুনতে পেয়েছিল, গুনগুন করে যেন আপন মনের একটা সুখের সুরে কথা বলছে বিভূতি, আমার অনেকদিনের ইচ্ছা এতদিনে সফল হলো।

—তার মানে?

—ঐ বস্তিটাকে দেখলেই আমার চোখ-দুটো ঘিনঘিন করতো।

—কারণ?

—কারণ, ঐ বস্তিতে যারা থাকে তারা…তারা হলো কতকগুলো দুশ্চরিত্র মেয়েলোক। ওটা একটা নরকগোছের জায়গা।

উত্তর দেয়নি নীরাজিতা। শুধু বিভূতির সেই শান্ত শুদ্ধ ও পবিত্র চেহারাটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। এবং মনে মনে যেন নিজেরই একটা ভুল আর্তনাদের লজ্জা সহ্য করেছিল। বিভূতির মত মানুষকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নীরাজিতা, কিন্তু সেটা বিভূতির দোষ নয়। বিভূতি ভুল করছে, বিভূতির অন্যায় হয়েছে, এতটা ভাবতে সাহস করতে পারে না নীরাজিতা। ভদ্রলোক কারও চরিত্রের কলুষ সহ্য করতে পারে না; এর জন্য

ভদ্রলোক এইরকম একটা মমতাহীন কাণ্ড করে ফেললো। করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সত্যিই তো মমতাহীন নয়।

আজও খরসোয়ানের এই অন্ধকারময় শান্ত সন্ধ্যায় নীরাজিতার সুরভিত চেহারাটা বারান্দার নিভৃতে পাইচারি করে ঘুরে বেড়ায় আর মাঠের বাতাস মাঝে মাঝে হুহু করে ছুটে আসে। নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা বোবা বাতাস যেন হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—নিশীথ রায়ের বুকটা কি এইরকম শান্ত কঠোর ও নির্বিকার?

বিশ্বাস হয় না; সে মানুষটার বুকটা তুবল নিশ্চয়। এইরকম একটা বস্তির কতকগুলি চরিত্রহীন প্রাণীর আর্তনাদ শুনে সে লোকটা বোধহয় নিজেই জলের ক্যানেস্তারা হাতে নিয়ে···

আবার সে ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করে কি বুঝতে চাইছে নীরাজিতা? একটা মমতাময় বুক থাকলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়ে যায় না।

এই তো, আজ প্রায় একমাস হলো, কোন একটা কোলিয়ারির এক কম্পাসবাবু এসেছিলেন। কম্পাসবাবুর মেয়ের বিয়ে; কিন্তু বিয়ের সব খরচ যোগাবার মত টাকা নেই। এদিক-ওদিকের দুচারটে মাইন্‌স-এর ভদ্রলোকেরা প্রত্যেকে দশ-বিশ টাকা সাহায্য করেছেন। এখন, আর একশো টাকা হলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যান কম্পাসবাবু।

বিভূতি আর নীরাজিতা যখন সকালবেলা ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিল, তখন এলেন কম্পাসবাবু। এবং বেশ আশান্বিত একটা ভাব নিয়ে, চোখের দৃষ্টিটাকে অদ্ভুতভাবে ছলছলিয়ে একশো টাকা সাহায্যের আবেদন শোনালেন। সব কথা শোনবার পর বিভূতি শুধু একটি কথা বললো, 'সরি'।

—আজ্ঞে?—ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন

বিভূতি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, না, হবে না

চলে গেলেন কম্পাসবাবু। এবং নীরাজিতা আবার বোধহয় একটা দুঃসহ বিস্ময়ের বেদনা সহ্য করতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল, ভদ্রলোককে কিছু টাকা দিলেই পারতে।

—তাতে লাভ ?

নীরাজিতার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে। —একটা অভাবের মানুষকে সাহায্য করা হলো, এই লাভ।

—আমার টাকাগুলো চ্যারিটির ফাণ্ড নয়, নীরাজিতা।

কিছুক্ষণ আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবার পর কেমন-যেন একটা আক্রোশের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

—হ্যাঁ।

—এই ভদ্রলোককে তুমি চেন ?

—খুব চিনি।

—ভদ্রলোকের মেয়েটিকে চেন ?

—অনেকবার দেখেছি। বেশ হাসিখুশী চেহারা, দেখতেও বেশ মেয়েটা।

—মেয়েটি কেমন ?

—তার মানে ?

—চরিত্র কেমন ?

—নিমাইবাবু, শ্যামবাবু, ঈশ্বরীবাবু সকলেই তো বলেন, খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে।

—তার মানে, সত্যিকারের ভাল চরিত্রের মেয়ে।

—তাই তো।

—তা হলে, অন্তত একটা সচ্চরিত্রতার জন্য খুশী হয়ে মেয়েটির বিয়েতে তোমার একশো টাকা সাহায্য করা উচিত ছিল না কি ?

—তুমি কম্পাসবাবুর তরফে ওকালতি করছো বলে মনে হচ্ছে।

নীরাজিতা হঠাৎ বলে ফেলে, আমি তোমাকে বুঝতে চাইছি।

বিভূতির চোখে সূক্ষ্ম একটা ভ্রুকুটির ছায়া কেঁপে ওঠে।
—আমাকে বুঝতে কি তোমার কিছু বাকি আছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তবে বুঝতে চেষ্টা কর।

—সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি, কম্পাসবাবুকে ওভাবে এক কথায় 'না' বলে ফিরিয়ে দিলে কেন?

—লোকটা ভয়ানক চালাক, এবং অসৎ।

—কেন?

—লোকটার ছোট একটা বাড়ি আছে। লোকটা অনায়াসে বলতে পারতো যে, আপনি দয়া করে বাড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন। তা হলে বুঝতাম যে, গরীব হলেও লোকটার মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যারা টাকা দান চায়, তারা মানুষ নয়।

—কিন্তু যারা টাকা দান করে, তারা তো অমানুষ নয়।

—আমার মতে তারাও অমানুষ।

নীরাজিতার চেহারাটা যেন নিশ্বাসহীন একটা স্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মত বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং বিভূতিই হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে। —আমি নিশীথ রায় নই, নীরা।

—তার মানে?

—মেয়েমানুষের দুঃখের কথা শুনলেই যে-চরিত্রহীনের মেরুদণ্ড মায়ায় গলে যায়, আর পকেট খালি করে টাকা ঢালে, সে-মানুষ আমি নই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে হাসতে থাকে নীরাজিতা। খরসোয়ানের এই চমৎকার শুদ্ধতার জীবন, যে জীবন চাঁদের আলোতে ধবধব করে, সেই জীবনের ভার যেন অলক্তকের মেয়ের অদৃষ্টের উপর অনড় হয়ে বসে কড়কড় শব্দ করছে। অলক্তকের মেয়ের সহ্যের পাঁজরগুলি পট্‌পট্‌ করে

বাজছে। সেই ভয়ানক যন্ত্রণাকে প্রচণ্ড একটা ফাঁকির হাসি দিয়ে ভুলিয়ে দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নীরাজিতা।

বিভূতিও হাসে। —এখন বুঝতে পেরেছ বোধহয়।

—হ্যাঁ।

—তবে? তুমি মিছিমিছি তর্ক করলে আমার বেশ খারাপ লাগে, নীরা।

নীরাজিতা হাসে। আর তর্ক করবো না।

আর তর্ক করেন নীরাজিতা। কারণ আর কিছু বেঝাবারও বোধহয় বাকি নেই। খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের এই বিভূতির জীবনে সোনারূপার কোন বালাই নেই ; আছে শুধু একটি ঐশ্বর্য, পরশমানিকের মত যে ঐশ্বর্য সব ঐশ্বর্যের সেরা—চরিত্র।

নীরাজিতার এই বিশ্বাসও মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়েছে। দেখেছে নীরাজিতা, বিভূতি নামে এই মানুষটির চরিত্রে যেন শানিত হীরার ধার আছে। তা না হলে, লিস্টারের বাড়িতে কক্‌টেল আর নাচের নিমন্ত্রণ পেয়েও সারাটা সন্ধ্যা নীরাজিতার কাছেই চুপ করে বসে থাকতে পারলো কেমন করে বিভূতি?

—না, নীরা; ওসব হুল্লোড়ের মধ্যে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—কোথা থেকে তিনটে ধিঙ্গি-ধিঙ্গি মিস্‌ এসে ঠাঁই নিয়েছে লিস্টারের বাড়িতে : ওসবের ছায়ার কাছেও যেতে নেই।

—কেন?

—গেলে বিপদে পড়তে হবে। ধিঙ্গিগুলোর পেটে এক গেলাস হুইস্কি-সোড়া পড়লেই আর রক্ষা নেই। হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেবে।

বিভূতির কথাগুলিকে শ্রদ্ধা করবার জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নীরাজিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বিভূতির গা ঘেঁষে

দাঁড়ায়। নীরাজিতার মনটাও যেন ব্যাকুলভাবে কামনা করছে, বিভূতির কথাগুলি শুনতে শুনতে খুশিতে ভরে যাক না কেন মন।

ঠিক সেই সময় বাইরে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় একটা মূর্তি; এবং সেদিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে নীরাজিতা, সেই কম্পাসবাবু এসেছেন।

—কি ব্যাপার? আবার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন?

কম্পাসবাবুর হাতে একটা হাঁড়ি। হাসছেন কম্পাসবাবু। আজ মেয়ে-জামাই এসেছে, স্যার। তাই এই সামান্য···

—কি?

—জয়নগরের মোয়া। জামাই নিয়ে এসেছে। সবসুদ্ধ চার হাঁড়ি এনেছিল। নিমাইবাবুর বাড়িতে, শ্যামবাবু আর ঈশ্বরীবাবুর বাড়িতে এক এক হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি; আর এটি স্যার আপনার জন্য···

হো হো করে হেসে ওঠে বিভূতি।—বেশ বেশ; এনেছেন, যখন, তখন রেখে যান।

বারান্দার মেঝের উপর হাঁড়িটাকে নামিয়ে রেখে এবং হাসিমুখে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন কম্পাসবাবু।

আর, নীরাজিতার চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। হাঁড়িটার দিকে নয়, বিভূতি নামে এই শুদ্ধচরিত্র মানুষের মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরাজিতা।

বিভূতি হাসে। —কম্পাসবাবুকে দেখে তুমি খুব চটে গিয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোমার মত মানুষকে কত সহজে ঘৃণা করতে পারে একটা সামান্য মানুষ।

—ঘৃণা?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি ? নইলে তোমাকে এক হাঁড়ি মোয়া দিয়ে যাবে কেন সেই মানুষ, যার মেয়ের বিয়েতে তুমি একশো টাকাও দিতে পারলে না, আর মানুষটাকে এক কথায় হাঁকিয়ে বিদেয় করে দিলে ?

বিভূতি হাসে। —লোকটা আমাকে ঘৃণা করতে এসে যে এক হাঁড়ি মোয়া রেখে যেতে বাধ্য হল।

—খুব লাভ হল বোধহয় ?

—খুব না হক, অন্তত পাঁচটা টাকা লাভ হল।

—তা হলে বল তোমার অপমানের ফী হল পাঁচ টাকা। যে-কোন মানুষ ইচ্ছে করলেই পাঁচটাকা তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার গায়ে···

আর বলতে পারে না নীরাজিতা। যে কথাটা নীরাজিতার মুখের কাছে চলে এসেছে, রুমাল দিয়ে চেপে যেন সেই কথাটাকে নীরব করে দেয়।

এবং সেদিনই খরসোয়ানের মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে বাথরুমের মিররের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার থুতু ফেলে যেন বুকের ভিতরের একটা ঘৃণার উদ্গার শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল নীরাজিতা।

—নীরা ? নীরা ?— আস্তে আস্তে হেঁটে আর মৃদুস্বরে ডাক দিতে দিতে এই সময় রোজই যেমন নীরাজিতার কাছে দাঁড়ায় বিভূতি, ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটু ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে, হন্তদন্ত হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসে বিভূতি। রোজই এই সময় চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে যে-ভাবে হাসে বিভূতি, আজ ঠিক সে-ভাবে নয়, যেন একটা অস্বস্তিকে কোনমতে রুক্ষ হাসি দিয়ে হাসিয়ে নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়ায়। এই সময় নীরাজিতার হাত ধরতে গিয়ে বিভূতির হাতটা রোজই যেমন একটু নরম হয়ে

যেতে চেষ্টা করে, আজ কিন্তু ঠিক তেমন করে নরম হয়ে যাবার চেষ্টা করে না। বরং, বিভূতির হাতটা যেন সন্দেহে ও অভিযোগে বেশ একটু কঠিন হয়ে নীরাজিতার হাত ধরে।—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নীরা!

আশ্চর্য হয় নীরাজিতা—কি?

—তুমি বাইরে এক রকম আর ভিতরে আর-এক রকম, ছিঃ।

চমকে ওঠে নীরাজিতা। —এরকম অদ্ভুত সন্দেহের মানে?

—তোমাকে আমি কোনদিন অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ করতে হচ্ছে।

নীরাজিতার চোখ জ্বলে ওঠে। —স্পষ্ট করে বল! কিসের অবিশ্বাস?

বিভূতি গম্ভীর হয়। —দোষ করেও তোমার এত রাগ করে কথা বলা একটুও ভাল দেখায় না।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—কিসের দোষ? চরিত্রের?

বিভূতি হেসে ফেলে।—ছিঃ, সে সন্দেহ থাকলে কি আজ তোমার হাত ধরে কথা বলতাম?

—সন্দেহ করলেই পারতে।

—সন্দেহ করব কেন? আমি ইডিয়ট নই। তা ছাড়া···

—কি?

নীরাজিতার কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস করে বিভূতি। আর, নীরাজিতার শরীরটা যেন ঘৃণাক্ত ক্ষতের জ্বালায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। খরসোয়ানের জীবনের সেই প্রথম রাতের আর্তনাদটা বুকের ভিতর গুমরে উঠেছে। বাথরুমের মিররটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত বেদনার স্মৃতি লুকিয়ে রেখে ভেজা শাড়ির কুণ্ডলীটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। নীরাজিতার বাইশ বছর বয়সের এই শরীরটার অনাহত চরিত্রনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়ে কি উৎকট খুশীর হাসি হেসেছিল অলক্তকের মেয়ের স্বামী।

বিভূতি বলে—সে কথা নয়। আমার অভিযোগ হল… আমার সন্দেহ…তুমি আমার আলমারি খুলে ব্যাঙ্কের জমার বই-গুলো নাড়াচাড়া করেছ আর দেখেছ।

—কেন এমন সন্দেহ হল ?

—আলমারির চাবিটা যেখানে থাকে, আজ চাবিটাকে সেখানে পেলাম না।

—তুমি মনে করে দেখ, চাবিটা কোথায় রেখেছিলে।

—চাবিটা টেবিলের দেরাজে ছিল। কিন্তু চাবিটাকে বালিশের তলা থেকে পেলাম।

—তুমিই বালিশের তলায় চাবিটাকে রেখেছিলে। কিন্তু ভুলে গিয়েছ।

—না ; আমার ভুল হয় না।

বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে আর দুচোখের চাহনিকে যেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে নীরাজিতা, তোমার ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো যদি আমি দেখে থাকি ত দেখেছি। তাতে তোমার ক্ষতি কি ?

—তাতে আমার লাভ কি ? ওসব জিনিস তুমি ছুঁলে কি আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ডবল হয়ে যাবে ?

—এতদিনে…এইবার বুঝলাম।

—কি বুঝলে ?

নীরাজিতার চোখের চাহনি যেন ঠক ঠক করে কাঁপে। হাতের রুমালটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে আস্তে একবার কামড়ে ধরে। তারপরেই হেসে ওঠে। —তুমি সচ্চরিত্র !

—ঠাট্টা করছো বলে মনে হচ্ছে।

—তোমার মত মানুষকে ঠাট্টা করব ?

—ছিঃ !

নীরাজিতাকে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টানে বিভূতি ; আর

নীরাজিতাও বিভূতির কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দেয়, আর অদ্ভুতভাবে, যেন ডুকরে ডুকরে হাসতে থাকে। বিভূতি বলে, রাজপোখরা থেকে চিঠি এসেছে।

—কে লিখেছে ?

—তোমার বাবা।

—কি লিখেছে ?

—সব ভাল খবর। একটা মজার খবরও আছে।

—কি ?

—সেই চরিত্রহীন দম্পতি রাজপোখরাতে এসেছেন।

—কে ? কে ? কারা এসেছে ?—ছটফট করে, বিভূতির হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।

—নিশীথ আর প্রতিভা। আধপাগলা বেকুব, সেই শিবদাস দত্ত একেবারে নির্লজ্জ হয়ে রোজই উৎসব করছে।

বিড়বিড় করে নীরাজিতা—জঘন্য ! কি ভয়ানক দুঃসাহস !

—কি বললে নীরা ?

—বেশ বুঝতে পারছি, বাবাকে অপমান করবার জন্য, চরিত্র-হীনতার বড়াই দেখাবার জন্য ওরা রাজপোখরাতে এসেছে।

—ছেড়ে দাও ওদের কথা।

নীরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে—না, কখ্‌খনো না।

বিভূতি আশ্চর্য হয়। —কি বললে ?

—আমি কালই রাজপোখরায় যাব।

—কিন্তু আমার ত ছুটি নেওয়া সম্ভব হবে না, নীরা।

—তুমি ছুটি নিয়ে পরে এস, আমি কালই চলে যাই।

নীরাজিতা যেন উতলা হয়ে ভয়ানক এক প্রতিশোধের স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।—কিন্তু আবার কি ? একবার অপমানিত হয়ে শিক্ষা হয়নি ; আবার এসেছে ; আমার সৌভাগ্যকে ঠাট্টা

করতে এসেছে একটা···এইবার আরও ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

প্রতিভা বলে—বড় জোর দুটি দিন, তার বেশি দেরি হবে না।

নিশীথ হাসে—ভয় হয়; শেষ পর্যন্ত সাত দিন করে ফেলবে।

—না, ইচ্ছে করে একটি দিনও দেরি করবো না।

—কিন্তু এই দুটি দিনই বা আমি একা একা কেমন করে··· !

—বই-টই পড়ে কোন মতে দুটি দিন পার করে দাও, লক্ষ্মীটি।

নিশীথ আবার হাসে—আচ্ছা, তাই হবে। এস তাহলে।

চাঁইবাসা যেতে হবে। প্রতিভার ছোট মাসিমা, যিনি তিন বছর ধরে রোগ-শয্যায় পড়ে আছেন, জপের মালা হাতে নিয়ে আর খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে চরম অন্তিমের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন যিনি, তিনি আর মালা জপতে পারছেন না। খবর এসেছে, বুকটা এখনও ঢিপ ঢিপ করছে। যে-কোন মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে।

তাই চাঁইবাসা যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন শিবদাস দত্ত। প্রতিভাও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে। মর-মর ছোট মাসিমাকে শেষ দেখা দেখে নিয়ে ফিরে আসবে।

কথা আছে, হরবংশবাবু তাঁর গাড়িটা পাঠাবেন। গাড়িটা এলেই রওনা হয়ে যাবেন শিবদাস দত্ত আর প্রতিভা। শিবদাস দত্তও নিশীথকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—মাত্র দুটো দিন নিশীথ। আমি ইসমাইল বাবুকে বলে রেখেছি; তাঁর পোলট্রি থেকে দুটো ভাল জাতের মুর্গি পাঠিয়ে দেবেন। তুমি আমার কুকিং ডিক্সনারি দেখে নিজের পছন্দ মত একটা রান্না বেছে নিয়ে···হ্যাঁ, যদি গ্রেভি একটু ঘন করে নিতে চাও, তবে পাঁচ চামচ কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে নিও।

কিন্তু ফটকের সামনে রাস্তার উপর যে গাড়িটা ছুটে এসে

দাঁড়াল, যে গাড়ির শব্দ খুব জোরে একবার গরগর করেই থেমে গেল, সেটা হরবংশবাবুর গাড়ি নয়। শিবদাস দত্ত সে গাড়ির দিকে তাকিয়েও চিনতে পারেন না, কার গাড়ি?

কিন্তু নিশীথ চিনতে পারে, এবং নিশীথের চোখ দুটোও একটু আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে। গাড়িটা যে কালিকাপুর মাইনসের জনষ্টনের গাড়ি।

গাড়ি থেকে প্রথমে যিনি নামলেন, তাঁকে খুব ভাল করেই চেনেন শিবদাস দত্ত। নিশীথও চিনতে পারে, তিনি হলেন এই লাক্ষানগর রাজপোখরারই মিসেস ফস্টার; বিয়ের দিনে যিনি এই বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এবং কত খুশি হয়ে নিশীথ আর প্রতিভাকে ব্লেসিং জানিয়েছিলেন।

কিন্তু মিসেস ফস্টারের পরেই গাড়ি থেকে নামলেন যে তরুণী, তাঁকে শিবদাস দত্ত চেনেন না। এক শাড়িপরা শ্বেতাঙ্গী তরুণী, ফরফর করছে তরুণীর সোনালী চুলের বব্।

নিশীথ কিন্তু তরুণীকে চিনতে পারে; আরও আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে নিশীথের চোখ। প্রায় এক মাস ধরে কালিকাপুরের জনষ্টনের বাংলোর বারান্দায় ছোট একটা কাঁচের গেলাস হাতে নিয়ে আরাম-চেয়ারের উপর যে নারীকে বসে থাকতে দেখেছে নিশীথ, সেই নারী।

কখনও গাউনপরা এবং কখনও ব্রিচেসপরা সেই নারীকে রোজই সন্ধ্যায় জনষ্টনের সঙ্গে বেড়াতে কিংবা শিকারে যেতে দেখেছে নিশীথ।

সেই মূর্তিকে আজ শাড়ি-জড়ানো সাজে দেখতে পেয়েও তার মুখটাকে বেশ স্পষ্ট চিনতে পারা যায়; এই তো সেই মুখ, যে মুখের রং কাচের গেলাসের চেরি-মদেরই মত সব সময় লাল টকটকে উচ্ছলতায় টলমল করতে দেখেছে নিশীথ। জানে না নিশীথ, কে এই আগন্তুক, জনষ্টনের বাংলোতে এসে প্রায় পনরদিন ধরে

যে ঠাঁই নিয়েছে। মাইন্‌স্‌-এর লোকেরা বলে, বিলেত থেকে জনষ্টনের এক বান্ধবী এসেছেন।

মিসেস ফস্টারের মুখ বড় গম্ভীর। কিন্তু শ্বেতাঙ্গী তরুণীর মুখটা যেন চটুল হাসির একটা ফোয়ারার মুখ। মিসেস ফস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এবং বাড়ির বারান্দার উপরে উঠে শিবদাস দত্তের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে শ্বেতাঙ্গী তরুণী।—নমস্কার!

বেশ ভাল বাংলা বলতে পারে এই শ্বেতাঙ্গী তরুণী। এবং, মিসেস ফস্টারই পরিচয় করিয়ে দেন—আমারই আত্মীয়ের, আমার এক কাজিন ব্রাদারের মেয়ে।

শ্বেতাঙ্গী হাসে—আমি লিজা মিটার; আমি আপনার মত একজন খাঁটি বাঙালীর পত্নী।

শিবদাস দত্ত বিব্রতভাবে হাসেন—শুনে বড় খুশি হলাম মা।

রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মিসেস ফস্টার।—কিন্তু আমি ওর জঘন্য উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে চাই।

শিবদাস দত্ত অপ্রস্তুতের মত তাকান।—উপদ্রব?

—হ্যাঁ, অসহ্য উপদ্রব। সব সময় মদ খুঁজছে, টাকা চাইছে আর গেলাস ভাঙছে। সেই কারণে আপনার কাছে এসেছি মিষ্টার দত্ত।

—আমি কি করতে পারি বলুন?

—আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিন। টাকাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। ও বলছে, এক হাজার টাকা হাতে পেলে চলে যাবে।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিসেস ফষ্টার।

—এই দুরন্ত মেয়ে সিমলা চলে যেতে চায়। চলে যাক, এখনি চলে যাক। আমি আর ওকে এক মিনিটও এখানে থাকতে দিতে ইচ্ছুক নই।...প্লীজ মিষ্টার দত্ত, আমাকে উদ্ধার করুন।

একটা চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে লিজা মিটার; আর

পা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে বার বার ঘরের ভিতরের একটা আলমারির দিকে তাকায়। জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

শিবদাস দত্ত উঠে দাঁড়ান; বোধ হয় টাকা আনবার জন্য ঘরের ভিতরে যেতে চান। লিজা মিটার হঠাৎ মাথা দুলিয়ে, আর সোনালী চুলের বব কাঁপিয়ে শিবদাস দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।—আপনার সেলারে ভাল বস্তু আছে বলে মনে হয়।

—চুপ লিজা, গর্জন করে ওঠেন মিসেস ফস্টার।

লিজা মিটার মুখে রুমাল ছুঁইয়ে আরও জোরে শব্দ করে হাসতে থাকে। প্রতিভার মুখের দিকে আস্তে একটা শিথিল চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকায়। আবার জ্বলজ্বল করে লিজা মিটারের চোখ।

উৎফুল্ল হয়ে হি হি করে হেসে হেসে কথা বলে লিজা—আমার স্বামী আপনারই মত বয়সের মানুষ। বড় চমৎকার মানুষ। বেচারা আমার ইচ্ছার ফ্রীডমে একটুও বাধা দেয় না। সেইজন্যেই আমি সুখী; আমার জীবন অত্যন্ত সুখী জীবন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের ডালিয়ার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ। প্রতিভা বারান্দা থেকে সরে গিয়ে সিঁড়ির তিন ধাপ নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস ফস্টার লজ্জিত ও বেদনার্ত মুখ নিয়ে এক হাতে কপাল টিপে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

টাকা আনতে ঘরের ভিতর চলে যান শিবদাসবাবু। লিজা মিটার বলে—মাত্র চার মাস হল স্বামীর সঙ্গে ইণ্ডিয়াতে এসেছি। ক্যালকাটাতে একমাস ছিলাম। বাস, তার পর আর নয়। স্বামীকে স্পষ্ট বলে দিলাম, ক্যালকাটার হোটেল নরকের চেয়েও খারাপ।

কেউ কোন প্রশ্ন করছে না, কিন্তু লিজা মিটারের মুখ থেকে যেন একটা বৃত্তান্তের ফোয়ারা আপনি উথলে উঠছে। ইণ্ডিয়াতে আসবার পর থেকে কোথাও একটানা এক মাস থাকতে পারেনি

লিজা মিটার। কলকাতার হোটেল ছেড়ে দিয়ে অল্প দিনের জন্য শিলং-এ গিয়েছিল লিজা। লিজার স্বামী বড় চমৎকার ভদ্রলোক, কোন আপত্তি করেননি। বরং, এক বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে নিয়ে এসে লিজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দমদম পর্যন্ত লিজার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন; আর প্লেন ছাড়বার আগে লিজাকে বিদায় দিতে গিয়ে লিজাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতেও চেয়েছিলেন; কিন্তু…।

শিলং-এর পর ডিব্রুগড়। মিষ্টার ওয়াল্টারের বাড়িতে পাঁচ দিনের অতিথির জীবন; কী চমৎকার পাঁচটি উৎসবের দিন। তার পর একটা চা-বাগান; সেখানে সাত দিন। মিষ্টার ডণ্ট, কী সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক। ডণ্টের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাতটি সকালের গল্‌ফ্‌ খেলার আনন্দ আজও ভুলতে পারেনি লিজা মিটার।

তারপর দার্জিলিং। তারপর ভাইজ্যাগ ও রাঁচি। এক এক জায়গা থেকে বন্ধুদের আমন্ত্রণ আসছেই, আর লিজা মিটারও সেই আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে।—প্রভাত-বেলার ঘুম-ভাঙ্গা সুখী হংসীর মত আমি উড়ে বেড়াই। বলতে বলতে আবার হেসে ওঠে লিজা মিটার।

শিবদাস দত্ত ঘরের ভিতর থেকে এসে মিসেস ফস্টারের হাতে টাকা তুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় লিজা মিটার। এবং মিসেস ফস্টারও লিজার হাতে টাকা ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়েন।

টাকা হাতে পেয়েই উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে তাকায়। ছটফট করে কাঁপতে থাকে লিজা মিটারের জ্বলজ্বলে চোখ।—আমার স্বামী, ভেরি ইনোসেণ্ট লাভিং স্বামী। বেচারা আমাকে ধরবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। খবর পেয়েছি, আমার খোঁজে শিলং-এ গিয়েছিল ভদ্রলোক। তারপর একবার ডিব্রুগড় ঘুরে সোজা রাঁচিতে

গিয়েছিল। আশংকা হয়, আজ হয়ত কালিকাপুরে এসে গিয়েছে ভদ্রলোক।...কিন্তু বৃথা...ভদ্রলোক বৃথা হয়রান হচ্ছেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লিজা মিটার। পর মুহূর্তে প্রায় একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে আর সিঁড়ি ধরে তরতর করে নেমে যেতে থাকে। মিসেস ফস্টার আর একবার জোরে হাঁপ ছাড়েন।

হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় লিজা। সোনালী চুলের বব দুলিয়ে আর অভিবাদনের ভঙ্গী করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়।—বিদায়; নমস্কার!

—আপনার স্বামীর নাম?

লিজা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—চমৎকার নাম। মিহিরকুমার মিটার।

চলে যায় লিজা। ফটকের কাছে এসে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—সিধা চলো খড়গপুর।

লিজা মিটারকে নিয়ে গাড়িটা শব্দ করে ফটকের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য শিবদাস দত্তের বাড়ির বারান্দাটা যেন শব্দহারা হয়ে যায়।

প্রথম কথা বলেন মিসেস ফস্টার।—কি অপমান! কি অপমান! নির্লজ্জ মেয়েটা আমার খানসামাকে চড় মেরেছে, ওর সন্ধ্যাবেলার রাক্ষুসে পিপাসার জন্য হুইস্কি এনে দিতে পারেনি বলে।...যাক, আপনাকে হাজার ধন্যবাদ, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি সাত দিনের মধ্যে আপনাকে টাকাটা দিয়ে যাব।

মিসেস ফস্টার বারান্দা থেকে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। শিবদাসবাবুও মিসেস ফস্টারের সঙ্গে নানা সান্ত্বনার কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। আর প্রতিভার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে নিশীথ রায়। ডালিয়ার বাগানের দিকে ওরকম ফ্যালফ্যাল করে ভীরুর মত তাকিয়ে আছে কেন প্রতিভা?

প্রতিভার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে নিশীথ—কি হল প্রতিভা ?

প্রতিভা মাথা নাড়ে !—কিছু না।

—লিজা মিটারের অবস্থা দেখে মন খারাপ লাগছে বোধহয় ?

—না।

—তবে ?

—মিহিরকুমার মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।

—কেন ?

—ভদ্রলোককে আমি জানি।

—কিরকম ভদ্রলোক ?

—সচ্চরিত্র।

চমকে ওঠে নিশীথ। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে নিশাথের চোখের চাহনি উদাস হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসের বাতাস হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে বুকের ভিতরে যেন গুম গুম শব্দ করে বেজে উঠল।

কথা বলতে গিয়ে নিশীথের ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় ; দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে শব্দ হয় যেন—এই মিহির মিত্রই বোধহয়···

—হ্যাঁ।

কেঁপে ওঠে নিশীথের চোখ। কত সহজে জীবনের এক ভয়ানক অপমানের স্বীকৃতি শুনিয়ে দিল প্রতিভা ! প্রতিভার এই মুখর দুঃসাহসের মূর্তিটিকে দেখতে ভয় করে, দেখতে ভাল লাগে না। মিহির মিত্রের অবস্থার কথা ভেবে শিবদাস দত্তের মেয়ের চোখে কি ভয়ানক ও কি নির্লজ্জ করুণা ছলছল করছে !

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল ! এতদিনে যেন গানটার অর্থ বুঝতে পারা যাচ্ছে। গানটা একটা ধিক্কার।

—বুঝলাম ! বলতে গিয়ে নিশীথের গম্ভীর গলার স্বর যেন তপ্ত

হয়ে ধক্‌ধক্ করে—বেচারা মিহির মিত্রের জন্য তোমার মায়া এখনও··· ।

—মিহির মিত্রের জন্য নয়।

—তবে কার জন্য ?

—মানুষের জন্য।

—উঃ, মস্ত বড় দার্শনিকের মত কথা বলছ দেখছি।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে প্রতিভা।—আজ বোধহয় আমাকে ঘেন্না করতে পারছ নিশীথ ?

—কি বললে ? হেসে ওঠে নিশীথ।

—কোন মানুষ কোনকালের একটা ভুলের জন্য মিহির মিত্রের মত এত বড় শাস্তি পাবে, ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না নিশীথ ; আমার সত্যি ভয় করে।

প্রতিভা নয়, মনে হয়, জীবনের রূপসাগরের একটা রহস্যের ঢেউ হঠাৎ উথলে উঠে কলস্বরে কথা বলছে। নিশীথের বুকের ভিতর একটা কাপুরুষ অহংকার যেন লজ্জা পেয়ে শিউরে উঠেছে। —প্রতিভা, ডাকতে গিয়ে প্রতিভার হাত ধরে ফেলে নিশীথ।

হেসে ফেলে নিশীথ ; আর, হঠাৎ যেন ছেলেমানুষের মত দুরন্ত আনন্দে চঞ্চল হয়ে প্রতিভাকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

ঘরের ভিতরে একটি বড় মিরর। তারই সামনে দাঁড়িয়ে নিশীথ আর প্রতিভা মিররের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে থাকে প্রতিভা, নিশীথ রায়ের মুখটা কি-সুন্দর পিপাসার আবেশে উৎসুক হয়ে প্রতিভার কপাল ছুঁয়ে রয়েছে। দেখতে থাকে নিশীথ, প্রতিভার হাত দুটো কি-নিবিড় আগ্রহে নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

নিশীথ হাসে।—উঃ, আর একটু হলে পরীক্ষায় ফেল করে ফেলতাম প্রতিভা।

—থাক ওসব কথা। এখন ছুটো দিন···।

ফটকের কাছে আগন্তুক গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। নিশীথ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে বলে—হরবংশবাবুর গাড়ি এসেছে বোধহয়।

নিশীথের কপালে হাত বুলিয়ে প্রভিতাও বিমর্ষভাবে বলে।—শুধু ছুটো দিন, লক্ষ্মীটি, মন খারাপ করো না।

নিশীথ হাসে—ইচ্ছে করলেই কি মন খারাপ বন্ধ করা যায়।

প্রতিভা হাসে—আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি, যাতে মন খারাপ না হয়।

—বল।

—এই ছুটো দিন শুধু মনে করবে যে, আমি এই পাশের ঘরে বসে আছি।

শিবদাস দত্ত ডাক দেন।—এইবার রওনা হতে হয় প্রতিভা।

আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার। —এ কি অদ্ভুত কথা বলছিস তুই? শিবদাস দত্তের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া তোর পক্ষে যে নিতান্ত একটা অপমান?

নীরাজিতা হাসে—অপমান না ছাই!

চমকে ওঠেন শীতল সরকার। —এখন যে ও-বাড়িতে নিশীথ আছে।

—থাকুক না।

—আজ যে ও-বাড়িতে শিবদাস দত্তও নেই, প্রতিভাও নেই। বাপমেয়েতে চাঁইবাসা চলে গিয়েছে; প্রতিভার এক মর-মর মাসিমার সঙ্গে শেষ দেখা করে আসবার জন্য।

—শিবদাস দত্তের কাছে আমার কোন কাজ নেই; প্রতিভার কাছেও না।

—তবে?—এইবার আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার। এবং বড় বউদিও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

—এ কি কাণ্ড, নীরাজিতা? তুমি আবার ও-বাড়িতে যাবার জন্য, মিছে কেন···। বউদি যেন একটা দুঃসহ উদ্বেগে বিব্রত হয়ে বার বার আপত্তি করতে থাকেন।

—কাজ আছে।

বউদি শিউরে ওঠেন।—কিন্তু বিভূতিবাবু যে আজই, আর কিছুক্ষণ পরে এসে পড়বেন।

—আসুক।

—কিন্তু নিশীথের কাছে ত তোমার কোন কাজ থাকতে পারে না।

নীরাজিতা হাসে।—নিশীথবাবুর কাছেই একটা কাজ আছে।

—ওরকম মানুষের কাছে তোমার কি কাজ থাকতে পারে?

নীরাজিতার ঠোঁট-দুটো অদ্ভুত রকমের শক্ত হয়ে যেন একটা দুরন্ত আক্রোশের আবেগে কেঁপে ওঠে।—ক্ষমা চাইব।

—কি?—শীতল সরকারের আর্তনাদ যেন অলক্তকের সব অহংকারের শান্তি চূর্ণ করে দিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যায় নীরাজিতা। অলক্তকের ফটক পার হয়ে, হতভম্ব ভীত ও করুণ অলক্তকের ছায়া পিছনে ফেলে রেখে, ঝাউ-এর ছায়া পার হয়ে, এবং ডালিয়া-বাগানের কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে শিবদাস দত্তের নীরব বাড়িটার বারান্দায় উঠে বাইরের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে অপলক চেখে তুলে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা।

ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ, আর, বোধহয় ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নীরাজিতা হাসে।—আমি ভুল করে চলে আসিনি। জানি, কাকাবাবু বাড়িতে নেই, প্রতিভাও নেই। আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছেই এসেছি।

নিশীথ আশ্চর্য হয়।—আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

—বল।

—হয় কাছে এস, নয় কাছে যেতে বল। তা না হলে কি করে বলি।

নিশীথের চোখের বিস্ময় এইবার যেন একটা রহস্যের ভয়ে ছমছম করতে থাকে।—আজ আর ও কথা তোমার বলা উচিত নয়।

—আজই যে বলবার সুযোগ পেলাম।

বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর এগিয়ে গিয়ে, এবং দরজার কাছে এসেই ঘরের ভিতরে যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে নীরাজিতা। চেয়ারের কাঁধটা ধরে আর নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।—ক্ষমা চাই নিশীথবাবু!

—তুমি ক্ষমা চাইছ কেন নীরাজিতা? আমি যে সত্যিই ···লোকে যাকে বলে···

চেঁচিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই কেঁদে ফেলে নীরাজিতা।—লোকে যাকে বলে চরিত্রহীন?

—হ্যাঁ।

চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে বিড়বিড় করে নীরাজিতা—আপনার বন্ধু বিভূতিবাবু একেবারে নিখুঁত পবিত্র-চরিত্রের মানুষ।

—তা বৈকি। বিভূতির শত্রুও বিভূতির চরিত্রের অপবাদ দেয় না।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু···

নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে, আর নিশীথের প্রায় বুকের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা। আর, নিশীথ যেন অসাড় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নীরাজিতার সেই হেঁট-মাথার সুন্দর খোঁপাটার দিকে অদ্ভুত এক মমতার চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে মাথা তোলে নীরাজিতা। —নিশীথবাবু!

—কি ?

—সত্যিই বুঝতে পারলেন না ? না, একটুও ইচ্ছে হয় না ?

—ক্ষমা কর, নীরাজিতা !

—কেন ?

—উচিত নয়।

নীরাজিতার মুখটা করুণ হয়ে হাসতে থাকে। —আমি ঠিক এই ভয় করেছিলাম, নিশীথবাবু।

—ভয় ?

—হ্যাঁ ; ভয় হয়েছিল, আপনি সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবেন কিন্তু…

—কি ?

—কি চমৎকার প্রতিশোধ !

শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের সামনে রাস্তারই উপর দাঁড়িয়ে একটা মোটরগাড়ির হর্ন যেন রুষ্ট ধিক্কারের গর্জনের মত হাঁপ ছাড়ছে। ডালিয়া-বাগানের বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে সেই গর্জনের শিহর এই ঘরের নিরালার উপর আছড়ে পড়ছে।

হো হো করে হেসে ওঠে নীরাজিতা। —বুঝতে পারছেন নিশীথবাবু ?

—কি ?

—হর্নের আওয়াজটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না কি ?

চমকে ওঠে নিশীথ। নীরাজিতা বলে—আপনার বন্ধুর গাড়ির হর্ন।

—কে ? বিভূতি এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—তুমি ভুল করে বড় অন্যায় করলে, নীরাজিতা।

নীরাজিতা হাসে। —অন্যায় ?

—হ্যাঁ, বিভূতি বেচারা হয়ত তোমাকে ভুল বুঝবে।

—কি ভুল বুঝবে ?

—একটা বাজে ধারণা করতে পারে বিভূতি, তুমি যেন ইচ্ছে করে আমার কাছে কিছু আশা করে…

—ঠিকই ধারণা করবেন আপনার বন্ধু।

খরসোয়ান ম্যাঙ্গানিজের বিভূতির গাড়ির হর্ন উদ্দাম হয়ে বাজতে থাকে। নিশীথ বলে—চল নীরাজিতা।

রুমাল দিয়ে কপালটাকে একবার মুছে নিয়েই নীরাজিতা বলে —চল।

আর, ডালিয়া-বাগানের কিনারা দিয়ে নিশীথেরই পাশে পাশে হেঁটে ফটকের কাছে এসে হেসে ওঠে নীরাজিতা। —তুমি কখন এলে ?

—এখনই ; তুমি এখানে কখন এলে ?

—অনেকক্ষণ হল।

বিভূতির চোখের উপর যেন ধোঁয়াটে আগুনের ছায়া ভাসতে থাকে। —তার পর…?

—তুমি বল।

—খরসোয়ানের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও ?

—নিশ্চয় চাই ; কিন্তু…

—কি ?

—তার আগে দেখতে চাই, তুমি নিশীথবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়েছ।

—নীরাজিতা !—চিৎকার করতে গিয়ে বিভূতির গলার স্বর যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

নীরাজিতা হাসে। —ভেবে দেখ।

—নীরাজিতা !

—ভেবে দেখ।

কি ভয়ানক স্নিগ্ধ ও শান্ত হাসি হাসছে নীরাজিতা। এবং

অলক্তকের খোলা ফটকটাও যেন বিভূতির সৌভাগ্যের, অহংকারের আর পবিত্র চরিত্রের দিকে তাকিয়ে একটা খোলা ঠাট্টার হাসি হাসছে।

স্টীয়ারিং-এর চাকার উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আনমনার মত কি-যেন দেখতে থাকে বিভূতি। হাতের শক্ত মুঠোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার পরেই গাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের ঝাউ-এর ছায়ার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিশীথের দিকে একটা অসহায় ও ভীরু চাহনি তুলে ডাক দেয় বিভূতি—একটা কথা শুনে যাও, নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে যেন একটা মিষ্টি খুশির ধমক ছাড়ে নীরাজিতা। —তুমি নিশীথবাবুর কাছে এসে কথা বল।